যাযাবরের মেয়ে

কৃষণ চন্দর

কিছুকথা

'যাযাবরের মেয়ে' কৃষণ চন্দরের প্রতিনিধিস্থশীল চারটি গল্পের সংকলন। লেখক হিসেবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর লেখা তাঁর এ ধরনের গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা অনেক। এখানে চারটি ভিন্ন স্বাদের গল্প সন্নিবেশিত করা হয়েছে। গল্প বা ছোটগল্প বললে যদিও আমরা সেটাকে কল্পনা বলে ধরে নিই, কিন্তু এ চারটি গল্প পড়ে মনে হবে এগুলো আদৌ গল্প নয় বরং বাস্তব জীবন-চিত্র। প্রতিটি গল্পই পাঠককে চুম্বকের মতো পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যাবে—এ বিশ্বাস আমার রয়েছে। পাঠকদের ভালো লাগলেই অনুবাদের পরিশ্রমজনিত প্রয়াস আমার সার্থক হবে।

—অনুবাদক

পড়ার মতো কয়েকটি বই

ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং	গন্তব্যের রাজপথ
দু'টি উদাস চোখ	পুরুষ শিকারী নারী
ফুলে ফুলে খুঁজে ফেরে	চাঁদ, হে চাঁদ
ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ	কানিভাল
এবং আলো এবং আঁধার	মাতাহরি
রক্তের মত লাল	ইণ্ডিয়ান কলগার্ল
প্রেমেশ্বরী	তিন গুণ্ডা
নির্মলা	লতিকা রাণী
মাটির প্রেম	শয়তানের পদত্যাগ
এজেন্ট এফ. সি. আই.	পাঁচ গুণ্ডা এক নায়িকা
বাবু গোপীনাথ	সুন্দর পৃথিবী
হংকং-এ এক রাত	দু'ফোঁটা পানি
নির্বাচিত আরবী গল্প	মাস্টার অপ্রকাশিত গল্প
লাভ স্টোরি	স্বর্গের শেষ ধাপ
এক লায়লা হাজার মজনু	আর পাবো না ফিরে
শহীদ	নগ্ন আওয়াজ
দরোজা খুলে দাও	প্রেমের নাম বেদনা
প্রথম স্ত্রী	নির্বাচিত গল্প
শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প : ১৯৭৯	গীতিময় এ জীবন
সেই মেয়েটি	চার সুন্দরীর প্রেমপত্র
এস মরি	কান্তাকুমারী
কোকোজান	একটি প্রেমের কাহিনী
ববি	অ-তে অজগর
প্রেম আমার প্রেম	পোড়া মাটির কাজ
আখেরী স্যালুট	বেড়াল এবং মন্ত্রী
জবানবন্দি	যাযাবরের মেয়ে
দুঃখকষ্ট	প্রেমিকার শেষ প্রশ্ন

সূচীপত্র

যাযাবরের মেয়ে ৯
মোবি ২৭
মিনা বাজার ৫৬
চুনি ভাই ৬৪

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.12.30 02:39:24 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

যাযাবরের মেয়ে

আমার গাঁ এখনো দশ ক্রোশ দূরে। সূর্য পশ্চিমাকাশে বেশ খানিকটা হেলে পড়েছে। খচ্চরের চলার গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। ঢালু মেঠো পথের অদূরে গাছের শাখায় রকমারী পাখীর কিচির-মিচির শোনা যাচ্ছে। সুমিষ্ট কণ্ঠে হঠাৎ একটি পাখী ডাক দিয়েই নীরব হয়ে যাচ্ছে। আসন্ন বিকেলের মতো পাখীটির কণ্ঠেও ক্লান্তির ছাপ। নীরব হয়ে যাওয়া পাখী যেন আসন্ন সন্ধ্যার আগমনের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। কে যেন বলছে, এখনই নয়, এখনই নয়। সম্ভবতঃ সন্ধ্যা এখনই আসবে না। তারপর হঠাৎ কোথা থেকে শীতল বাতাসের ঝাপটা তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়ায় সে তার প্রেমিকের আগমন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে লতাগুল্মে ঘেরা তরুশাখায় আনন্দে চিৎকার দিয়ে বলছে, আসবে, আসবে, অবশ্যই সে আসবে। এরূপ আশা-নিরাশার মাঝেই যেন কোথাও রয়েছে খুশীর মঞ্জিল। কিন্তু আমার গাঁ তো এখনো দশ ক্রোশ দূরে। অথচ আমার খচ্চর ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। ক্ষুধায় কাতর হয়ে সে বারবার কান দোলাচ্ছে, থেমে যাচ্ছে, নাসিকা কুঞ্চিত করছে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। মঞ্জিলের প্রত্যাশা তাকে দিশে-হারা করে তুলেছে। পা টেনে টেনে কোন রকমে সে শেষ পর্যন্ত এখানে ঢালু মেঠো-পথের প্রান্তসীমায় পৌঁছলো। এখানে নীচে পাহাড়ের পাদদেশে জোড়াতালি দিয়ে তৈরী একটি সেতু রয়েছে। নতুন ফোঁটা বনফুলের সুবাস ভেসে আসছে। এখানে পৌঁছে আমার খচ্চর থেমে গেল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে এক পা সামনে বা পেছনে নেয়া সম্ভব হলো না। অগত্যা আমি নীচে নেমে খচ্চরের লাগাম ধরে পাহাড়ের পাদদেশে সেতুর কাছে পৌঁছলাম। বহুকাল আগে পাণ্ডারা এ সেতু তৈরী করেছে। এখানে রয়েছে খুবানী গাছ। আমি খচ্চর বেঁধে তার সামনে সাথে নিয়ে আসা খাবার দিয়ে নিজের জন্য যবের রুটি

এবং ভনিয়ার এর শাকি বেল্ল করলাম। মনে মনে ভাবলাম—আহা, এখন যদি কোনখান থেকে একটা সবুজ কাঁচা মরিচ আর খানিকটা চাটনি পাওয়া যেতো তা'হলে কি যে ভালো হতো!

আগেও দু'একবার কাজ নিয়ে আমি এ পথে যাতায়াত করেছি। জলাশয় থেকে কিছু দূরে দিগন্ত বিস্তৃত ধান ক্ষেত। ক্ষেতের প্রান্তসীমা থেকে শুরু হয়েছে চমনকোটের জনপদ। চমনকোটের এক গাঁয়ে আমার মামা আল্লাদাদ খান বাস করেন। তিনি সারা এলাকায় ডাকাতি, দস্যু-বৃত্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পক্ষান্তরে, আমার বাবা ছিলেন সরকারী কর্মচারী। আমাদের রংপুর গাঁয়ের লোক খুবই শান্তি-প্রিয়। এ কারণে আত্মীয়তার বন্ধন থাকা সত্বেও আমি চমনকোটে মামার বাড়ীতে ওঠা সমীচীন মনে করলাম না। এখন বেলা পড়ে এলেও যেভাবে হোক রংপুর গাঁয়ে পৌঁছানোই সমীচীন মনে হলো। আমার কাছে একটা বড় ধরনের কৌটোয় সরকারী ট্যাক্সের বেশ কিছু টাকা ছিল। যদিও আল্লাদাদ ছিলেন আমার মামা, একটা দোনালা বন্দুক, কয়েকটি কার্তুজও আমার কাছে ছিল এবং গুলীতে লক্ষ্যভেদ করার ব্যাপারে আমি ছিলাম সিদ্ধহস্ত, তবুও এখানে রাত কাটাতে আমার মন সায় দিল না। খচ্চরটা কিছু সময় বিশ্রাম করুক, তারপর তাকে টেনে-হিঁচড়ে যেভাবে হোক নিয়ে যাবোই নাশতা খেয়ে আমি খচ্চরের প্রতি তাকালাম। সেও তার আহার সমাধা করেছে। বন্ধন খুলে দিয়ে তাকে আমি জলাশয়ের প্রতি অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত করলাম। আমি মুখ নীচু করে পশুর মতো পানি পান করতে লাগলাম। আমার দেখাদেখি খচ্চরও পানি পান করছিল। খচ্চর আমার এতো কাছাকাছি এসেছিল যে তার মুখের গরম নিঃশ্বাসও আমি পাচ্ছিলাম। ঘাস আর চনার গন্ধ মেশানো সে নিঃশ্বাস। আমার প্রতি মুখ বাড়িয়ে দিলে আমি খচ্চরের মুখ সরিয়ে দিলাম। তার আদর করার এ কায়দা আমার পছন্দ হলো না।

—এ জলাশয় পশুদের জন্য নয়। পেছন থেকে কে একজন বললো। অর্থাৎ বোঝাতে চাচ্ছিলো—এ জলাশয়ে মানুষদের জলপানই নিয়ম, পশু-

দের জলপান নিষিদ্ধ। তাকিয়ে দেখি দু'টি যুবতী মেয়ে। তাদের মধ্যে কেউ একজন কথাটা বলেছে। উভয়েই যথেষ্ট সুন্দরী। স্মিত হাসিভরা মুখ। গৌরবর্ণা ডাগর কালো চোখ। একজনের মুখমণ্ডল গোলাকৃতি অন্যজনের লম্বাটে। তবে উভয়ের ত্বকই নাশপতি ফলের মতো মিহিন মোলায়েম। উভয়েরই খালি পা। পরিধানে কালো ঘাঘরা। ঘাঘরার উপর কালো রঙের কামিজ। হাতে-পায়ে শ্রম অভ্যস্ততার চিহ্ন প্রকট। হাতের কিছু অংশ এবং পায়ের কিছু অংশ তাদের স্বাভাবিক গাত্রবর্ণের চেয়ে ভিন্ন রকম। ধূসর বর্ণের। এমন এক সময় আসবে যখন তাদের হাতের রং ধূসর থাকবে না। বিগত যৌবনা যখন হবে, তখন হাত পায়ের রং হবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। নাশপাতির মতো মোলায়েম ত্বকের উপর সময়ের ধারলো চাকু সৌন্দর্যহীনতার চিহ্ন এঁকে দেবে। তারা তখন হয়ে পড়বে লোলচর্ম বৃদ্ধা। চেহারায় সোনালী আভার চিহ্ন মাত্র থাকবে না। কিন্তু হে অন্ধ দার্শনিক, এখন দেখো তাদের চেহারায় যৌবন নৃত্য করছে। স্মিত হাস্যপূর্ণ অধর মৃদু কাঁপছে। কপোলের সেবফল চিকচিক করছে। দেখে মনে হয় পশ্চিমাকাশের অস্তায়মান সূর্যের অস্তরাগের রং বসন্তের রূপ ধারণ করে ও দু'টি অবয়বে নেমে এসেছে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আমি তাদের প্রতি তাকিয়ে রইলাম লম্বাটে চেহারার মেয়েটি বললো, এ জলাশয় পশুদের জন্য নয়।

আমি বললাম, প্রতিটি মানুষই পশু। যারা পানি পান করে তারাই পশু। সে মানুষ হোক, বা খচ্চর হোক। পান করো খোকা। এ কথা বলে আমি খচ্চরের প্রতি তাকিয়ে তার লাগামে হাত রাখলাম খচ্চরটিও আমার মতো অবাক দৃষ্টিতে যুবতী দু'জনকে দেখছিল। (হায়! এদেশে বেচারা খচ্চরও বুঝি যৌনক্ষুধা থেকে মুক্ত নয়!) খচ্চরকে টেনে জোর করে তার মুখ জলাশয়ের নিটোল পানির উপর ছুঁইয়ে দিলাম।

লম্বাটে চেহারার মেয়েটির চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠলো। দ্রুত পায়ে সামনে এগিয়ে সে খচ্চরের লাগাম ধরে তাকে নিজের দিকে টান দিল। খচ্চর স্ফুর্তিভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে মেয়েটির দিকে যাচ্ছিলো, তার গায়ের ধাক্কায় সুন্দরী যুবতীর কাঁধের কলস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

আমি খিলখিল করে হাসলাম। গোলাকৃতি চেহারার মেয়েটি, যাকে তার মোহনীয় চেহারার কারণে নাশপাতি বলাই সমীচীন, সেও খিলখিল করে হাসতে লাগলো।

—এতে হাসির কি আছে মারজানা? ক্রুদ্ধকণ্ঠে এ কথা বলেই লম্বাটে চেহারার মেয়েটি মারজানার কাঁখের কলসী টেনে নিয়ে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেললো। অনুকূল স্রোতে বেশ কিছু পথ কলসী ভালোয় ভালোয় যাওয়ার পর হঠাৎ বড় ধরনের এক ঢেউয়ের দোলায় উঁচু তীরের শক্ত মাটিতে আঘাত খেয়ে ভেঙেচুরে ডুবে গেল। আমরা অপলক বিস্ময়ে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম।

—হায়! হায়! আমি হাসিমুখে হাত কচলাতে কচলাতে বললাম।

—হাসছো কেন? প্রথমোক্ত লম্বাটে চেহারার মেয়েটি দাঁতে দাঁত পিষে বললো।

আমি বললাম, দু'টি পশুর লড়াইয়ে কলসী ভেঙ্গে যায়।

মেয়েটি বললো, তুমি পশু, শূয়র কোথাকার! একে তো জলাশয় খারাপ করছো খচ্চরকে পানি পান করিয়ে, তদুপরি আমাদের কলসী—। এখন আবার কথা সাজানো হচ্ছে। নাও পয়সা বের করো, তা নইলে···।

—তা নইলে কি হবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—আমি তোমার খচ্চর নিয়ে যাব। এ কথা বলে মেয়েটি খচ্চরের কাছে গেল এবং আমি কিছু বলার আগেই চোখের পলকে খচ্চরের পিঠে উঠে খচ্চর ছুটিয়ে দিল। মারজানাও খচ্চরের পেছনে পেছনে দৌড়াতে শুরু করলো। আমি সেদিকে বন্দুক তাক করলাম। একবার ভাবলাম দিই গুলী করে, এমন রাগ ধরেছিল। কিন্তু কি করি, মেয়ে মানুষের উপর কি হাত তোলা যায়?

—এ্যাই শোনো, শোনো তো! খোদার কসম, আজই আমাকে রংপুর পৌঁছতে হবে। এই নাও পয়সা। থামো, থামো। খোদার কসম। আজ আমাকে পৌঁছতে হবে।

কিন্তু সে হারামজাদী কিছুই শুনলো না। খচ্চর আগে হাঁটতে না পারলেও এখন উঁচু থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে দেয়া পাথরের

মতো দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছিলো; মারজানাও হরিণীর মতো দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পর উভয়ে পেছনে ফিরে আমার প্রতি তাকিয়ে হাসছিল। আমি বললাম, দেখিস শূয়রের বাচ্চি, আজ রাতেই যদি তোকে বিয়ে না করি তা'হলে আমার নাম শাহজামাল নয়। লতাগুল্ম ভরা উঁচু-নীচু নদীতীর ধরে আমিও ছুটে যাচ্ছিলাম। দোনালা বন্দুক এবং কার্তুজের বোঝা না থাকলে কখন ধরে ফেলতাম। দৌড়াতে দৌড়াতে আমার নিঃশ্বাস ফুলে উঠলো। আমি থেমে গিয়ে চিৎকার করে বললাম, থেমে যা ওই ডাকাতের মেয়ে, খচ্চরণী। না থামলে এখুনি গুলী করবো। কিন্তু আমার ধমক শুনে হতভাগিনীরা পেছনের দিকে ফিরেও চাইলো না। তারা একইভাবে খচ্চরকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। আমি একটা উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিলাম। তারা নীচের ঢালু সমতল পথ ধরে চলে যাচ্ছিলো। বেশ কিছু দূরে কুলু কুলু শব্দে বয়ে চলেছিল একটি ছোট নদী। এক টুকরো শ্যামল সবুজ ঘিরে মুক্ত আকাশতলে কয়েকটি তাঁবু। এ তাঁবু তো যাযাবর ছাড়া অন্য কারো হতে পারে না। তাঁবুতে প্রজ্জ্বলিত আগুন এবং সে আগুনের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিলো। সে ধোঁয়া ওঠার কারণে মেঘের রং ধূসর ঘোলাটে মনে হচ্ছিলো। সে ধোঁয়ার মেঘ নক্ষত্রের ফুলের সাথে লুকোচুরি খেলছিল। মারজানা এবং খচ্চরের উপর আরোহণ-কারিণী উভয় যুবতীকে সেই তাঁবুর কাছে নেমে ভেতরে যেতে দেখলাম। খচ্চর বাইরে ঘাস খাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পর ভেতর থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে কানপটির কাছে হাত তুলে আমার প্রতি একবার তাকালো, তারপর একটা তাঁবুর পাশে খচ্চর বেঁধে ভেতরে চলে গেল। আমি ভাবলাম—এবার যাযাবরদের পাল্লায় পড়েছি। তাদের সাথে যুঝতে হবে। পরে ভাবলাম—আমার মামা আজাদদ খানের কাছে সাহায্য চাইবো। কিন্তু আমার কাছে যে সরকারী অর্থ রয়েছে, মামা যদি এটা জানতে পারে তা'হলে আমার উপরই ডাকাতি করবে না তো? কিন্তু এখন একাকী এ যাযাবরদের সাথে মোকাবিলা করতে হবে। শেষে ভাবলাম—যাকগে, এ দোনালা বন্দুক তাদের ভয় দেখানোর

জন্য যথেষ্ট হবে। এটা ভেবে দ্রুত পায়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করলাম। সূর্য অস্ত যাওয়ায় ইতিমধ্যে সন্ধ্যার আঁধার চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তাঁবুতে আগুন জ্বলছে·····একটা খুটির সাথে বাঁধা আমার খচ্চর চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যাওয়ার পর সে অসহায় চোখ তুলে আমার প্রতি তাকালো। মনে মনে বললাম—ভয় পেও না, আমি তোমাকে এ জালিমদের কবল থেকে মুক্ত করব। সামনের দিকে পা বাড়ালাম।

—কে ওখানে?

—আমি একজন মানুষ।

—মানুষ নাকি পশু! দু'হাত কোমরে রেখে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে খচ্চর নিয়ে আসা লম্বাটে চেহারার মেয়েটি বললো। তাঁবুর পর্দা দুলে ওঠায় ভেতরের প্রজ্বলিত আগুনের শিখার আলো তার মুখমণ্ডলে এসে নৃত্য করছিল।

—শামা, তুমি ভেতরে যাও। পুরুষ লোকটি বললো। আমি ওর সাথে বোঝাপড়া করছি।

—আমি ঝগড়া করতে আসিনি, তোমার বউ আমার খচ্চর চুরি করে এনেছে। ওটি আমাকে দিয়ে দাও। আমি বললাম।

—আমার বোনকে আমার বউ বলো না, মুসাফির।

আমি রুঢ়কণ্ঠে বললাম, তোমার বোন, বউ বা মা যেই হোক না কেন, সেটা আমার জানার দরকার নাই। আমি আমার খচ্চর ফিরে চাই।

—আমি তোমার মা হই, শূয়রের বাচ্চা! চিৎকার করে এ কথা বলে শামা তাঁবুর বাইরে এসে দাঁড়ালো।

—তুমি চুপ কর শামা। এ অচেনা আগন্তুকের সাথে আমাকে বোঝাপড়া করতে দাও। আমি তার সাথে কথা বলছি।

শামা ভিতরে চলে গেলে লোকটি আমাকে বললো, তুমি কোথায় থাকো?

—রংপুর

—তোমার নাম?

—শাহজামাল।

—কি কাজ করো?

—আমি? আমি তহশীলদারের ছেলে।

—আমি জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি করো—আর তুমি বলছো আমি তহশীলদারের ছেলে।

আমি বললাম, আমি শিকার খেলি, প্রেম করি, কখনো বাবার জন্য গাঁ থেকে খাজনা উশুল করি। আচ্ছা, এবার আমার খচ্চর দাও। এ কথা বলে আমি খচ্চরের প্রতি অগ্রসর হলাম।

লোকটি বললো, দু'তিন দিন পর আমরা রংপুর যাব। ওখানে ক্ষেতে কাজ পাওয়া যাবে?

আমি বললাম, তোমরা যাযাবররা বড় কামচোর। কাজের প্রতি তোমাদের কোন মনোযোগ নেই। সারাদিন ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াও কৃষকদের ভেড়া-ছাগল চুরি করো আর গাঁ ছেড়ে যাওয়ার পর জানা যায় অমুক কৃষকের লাঙ্গল চুরি গেছে, অমুকের ঘরের মুরগী চুরি গেছে, অমুকের ছাগল পাওয়া যাচ্ছে না, অমুকের গাধা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

সে বললো, এসব তো সাধারণ ব্যাপার, ছোটখাট কথা, তোমরা হলে ভূস্বামী। এসব ছোটখাট বিষয়ের প্রতি তোমাদের মনোযোগ না দিলে ভালো হয়। লোকটির বলার ভঙ্গিতে লজ্জা-সংকোচের ছাপ। শেষে বললো, আমাদের কাজের খুবই প্রয়োজন।

—চমনকোট তোমাদের পছন্দ হয় না?

—জায়গা তো মন্দ নয়, কিন্তু ডাকাতের মহল্লা। আল্লাদাদ তো আমাদের ভয় দেখায়, হুমকি দেয়। এখানে যদি থাকি তবে তো কোন দিন খুন-খারাপী হয়ে যাবে। হঠাৎ সে হাত প্রসারিত করলো। তার হাতে একটা বন্দুক।

খানিক থেমে সে বললো, তুমি নিজের খচ্চর নিয়ে যাও। আমার বোন তো নির্বোধ। পথচারীদের সাথে কে ঝগড়া বাধায়? তুমিও তো সাময়িকভাবে হলেও আমাদের মতো যাযাবর। এ কথা বলে সে

হাসলো। তার হাসি খুবই মিষ্টি, খুবই আকর্ষণীয়।

কাছাকাছি এক তাঁবুতে এক বৃদ্ধা, একজন যৌবনবতী মহিলা, দুটি শিশু এবং প্রৌঢ় একজন যাযাবর দেখা যাচ্ছিলো। সবাই বসে আহার করছে। বৃদ্ধা কাঠের চামচ দিয়ে হাঁড়ি থেকে ঝোল তুলে নিয়ে সবাইকে ভাগ করে দিচ্ছে। সে ঝোলের সুবাস আমার নাকে এসে লাগছিল।

আমাকে সেদিকে তাকাতে দেখে লোকটি অর্থাৎ শামার ভাই বললো, এসো আজ রাতে এখানেই থাকো। সামনে ভয়ানক জঙ্গল রয়েছে। একাকী যাবে কিভাবে?

—আমি একা নই, আমার সাথে বন্দুক রয়েছে। আমি বললাম।

—দোনালা বন্দুকের ব্যাপারে তোমার খুবই অহংকার, তাই না? তুমি ওটা চালাতে জানো? এ কথা বলে সে হাসলো। তার হাসি বড় মিষ্টি, বড় আকর্ষণীয়। আমি তার কথার শ্লেষ গায়ে মাখলাম না। নীরবে তাকে অনুসরণ করলাম।

মাটি খুঁড়ে তৈরী করা উনুনের উপর হাঁড়িতে তরকারী রান্না হচ্ছে। মারজানা পাশে বসে খুন্তি দিয়ে সে তরকারী নাড়ছে এবং আগুনের তাপ কখনো কমাচ্ছে কখনো বাড়াচ্ছে। উনুনের এক পাশে বসে মুখ নীচু করে যবের রুটি তৈরী করছে। উনুনের আগুনের আলো তার চেহারায় এসে পড়া চুর্ণ-কুন্তলের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। সে এক মোহন দৃশ্য। মারজানার চোখে বিস্ময়, শামার চোখের ভাষা দুর্বোধ্য। রাতের শয়নের জন্য পেতে রাখা বিছানা থেকে পুরনো ধানের গন্ধ ভেসে আসছিল। নোংরা খুঁটি, রং-বেরংয়ের কাপড়ের টুকরো আর গমের খড় দিয়ে তৈরী তাঁবু দেখতে হালকা হলেও আসলে কিন্তু বেশ মজবুত।·····এক কোণে দু'টি বড় বড় গাঁটরি। একটা দুগ্ধবতী ছাগল খুঁটির সাথে বাঁধা। সম্ভবতঃ বদ নজর থেকে রক্ষার জন্য তার স্তনে একটা পুরনো ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখা হয়েছে। লোম-ওঠা রুক্ষ চামড়ার একটা কুকুর আমাকে তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করতে দেখে ঘেউ ঘেউ করছিল। শামার ভাই ক্রুদ্ধকণ্ঠে তাকে ধমক দিল, চুপ রে জালিম। কুকুরটি সাথে সাথে নীরব হয়ে গেল। কুকুরটির

গায়ের লোমগুলো মিশকালো। চোখ দু'টি লাল। ভালোই নাম পেয়েছে—জালিম।

লোকটিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

—আমার নাম খোদাদাদ।

—তোমার বোনকে বিয়ে দিচ্ছ না কেন? স্বামীর হাতে পিটুনি না খেলে এ মেয়ে দুরস্ত হবে না।

খোদাদাদ হেসে বললো, দুরন্ত করার মতো স্বামী পাওয়া গেলে তো!

আমি বললাম, ওই শূয়রণীকে আমার সাথে বিয়ে দাও। মেরে তার চামড়া যদি তুলে না দিই তো আমি শাহজামাল···

কথা শেষ হওয়ার আগেই শামা বিদ্যুৎ বেগে উঠে দাঁড়িয়ে তার ভাইয়ের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে বললো, হাত লাগিয়ে দেখো তো! পথচারী হওয়ায় রেহাই পেলে। অন্য কেউ হলে এ বন্দুকের ছররায় কলজে ছিদ্র করে দিতাম।

খোদাদাদ হেসে বললো, শামা সত্যি কথাই বলছে। ওর গুলী কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, আমিও তো সে কথাই বলছি।

আমার এ কথা শুনে শামা দ্রুত পেছন ফিরে মারজানার কাছে গিয়ে বসলো। মারজানা অবাক বিস্ময়ে তার ডাগর চোখ তুলে আমার প্রতি তাকিয়ে ছিল। শামা দাঁতে ঠোঁট কামড়াচ্ছিল। খানিক পর সে কাঠের স্তূপের কাছে গিয়ে বসলো এবং হাতে লেগে-থাকা যবের আটা খুটে খুটে ছাতু তৈরী করতে লাগলো। এদিকে শামার তৈরী রুটি উনুনে সেঁকে নেয়া হচ্ছিলো। রুটি থেকে তাজা যবের সুবাস ভেসে আসছিল। সামনের তাঁবুতে একটা শিশু কাঁদছে। তার মা তাকে গাল দিচ্ছে। শিশুর বাবা চরকা চালিয়ে চকমকি তৈরী করে কাঁচিতে শান দিচ্ছে। শিশুকে ধমক দিয়ে সে বললো, চুপ কর শয়তানের বেটা। নইলে তোর বুকে কাঁচি বিঁধিয়ে দেব।

শিশুটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, শয়তানের বেটা হচ্ছো তুমি আব্বা।

বাবা কাঁচির ধার পরীক্ষা করতে করতে হেসে ফেললো। তারপর

জোরে চরকা ঘুরিয়ে কাঁচির এক পাশ চকমকির উপর ছোঁয়ালো। অন্ধকারে স্ফুলিঙ্গের মতো আলোক ফুলঝুরি সৃষ্টি হলো।

—খোদাদাদ!

—কে, রাভেল?

হ্যাঁ।

—কি বলছো রাভেল?

—আজ তাঁবুর বাইরে আসবে না ভাই? এখন চমৎকার জ্যোছনা।

আমরা তাঁবুর দরজা বন্ধ করে ভেতরে রশি পাকাচ্ছিলাম। আমি এবং মারজানা শনের খড় ভিজিয়ে রশিতে লাগাচ্ছিলাম। শামা রশির এক মাথা পায়ের আঙুলে চেপে রেখেছিল, অন্য মাথা খোদাদাদ পাকাচ্ছিল। শামার পা একটুও নড়ছিল না, তবে তার চেহারা রক্তিম হয়ে উঠছিল, চোখের পলক ভারী হয়ে আসছিল। শামা সর্বশক্তিতে রশির মাথা চেপে রাখছিল। তীক্ষ্ণ ন্যাকের কুঞ্চন, ঘন ঘন নিঃশ্বাস এবং পাতলা লাল জিহ্বা বের করে ঠোঁটের উপর ফিরিয়ে নেয়া শামাকে অপূর্ব রূপের প্রতিমূর্তি মনে হচ্ছিল। বিশেষতঃ তার জিহ্বা বের করে ঠোঁট ভেজানোর ভঙ্গি দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম।

রাভেলের আহ্বানে খোদাদাদ উঠে তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, যেন প্রকাশমান চাঁদের হাসি নাক দিয়ে শুঁকছে। শামা এমনভাবে বসেছিল যে, তাঁবুর পর্দা সরে যেতেই একরাশ দুধসাধা জ্যোছনা তার চেহারায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তারপর সে জ্যোছনা তাঁবুর শেষ দিকে যেখানে ছাগলটি বাঁধা ছিল সেখানেও পৌঁছে গেল। শামার গৌরবর্ণ চেহারায় মর্মর পাথরের সৌন্দর্যের ছাপ ফুটে উঠলো। তার চোখ নিচু হয়ে আছে, আধ-বোজা চোখের ভেতর কালো মণিতে চাঁদের আলো কাঁপছে বলে আমার মনে হলো। জ্যোছনার উচ্ছল যৌবনের কারণে হোক অথবা দৃষ্টির মুগ্ধতার কারণেই হোক, শামার মুখমণ্ডলে আমি বেলোয়ারী কাচের সজীবতা লক্ষ্য করলাম। খোদাদাদের কণ্ঠস্বর আমাকে ধ্যানমগ্নতা থেকে মুক্ত করলো। সে বলছিল, শাহজামাল, বাইরে এসো। শামা—মারজানা—

শামা তার ভাইয়ের গাদা বন্দুক এবং আমার দোনালা বন্দুক হাতে নিয়ে বাইরে বেরোলো। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে বললো, তোমার অহংকারের পরীক্ষা নিতে চাই।

বাইরে গিয়ে দেখি, রাভেল দাঁড়িয়ে আছে। ছফুট লম্বা দেহ। খালি পা। ঘেরা দেয়া সালোয়ার হাঁটু পর্যন্ত ঢেকেছে, নীচের অংশে কোন আচ্ছাদন নেই। পায়ের গোড়ালী থেকে হাঁটু পর্যন্ত খালি পায়ে অসংখ্য জখমের চিহ্ন। মাথায় লম্বা খোলা চুল। সে-চুলের উপর বাগদাদের চোরের মতো একটা রুমাল বাঁধা রয়েছে। ডান কানে একটা লোহার বালি। যাযাবর নয়, তাকে মনে হচ্ছিল যেন সিনেমার নায়ক। আমার প্রতি তাকিয়ে রাভেল হাসলো, তারপর শামার চেহারায় তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো।

রাভেল খানিক পর বললো, খোদাদাদ বলছে, তোমার কাছে ইংরেজী বন্দুক রয়েছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই দেখো পখিকের বন্দুক। শামা বললো।

রাভেল মনোযোগ সহকারে বন্দুকের প্রতি তাকিয়ে বললো, এ কেমন বন্দুক? এর এক নলে দাঁত রয়েছে, অন্য নল আমাদের গাদা বন্দুকের মতো বিলকুল পরিষ্কার।

আমি বললাম, দাঁতওয়ালা নলে বড় শিকারের জন্য গুলী ভর্তি করি। সোজা নলে তিতির শিকার করি। আর এই হচ্ছে গুলী ভর্তি কার্তুজ। এটি ছররাওয়ালা। দেখো—এই যে।

রাভেল বললো, ইংরেজী রাইফেল ভালো, কিন্তু আমাদের গাদা বন্দুকের মোকাবেলা করে না।

শামা বললো, বন্দুক ভালো-মন্দ হয় না। ভালো-মন্দ হচ্ছে যুবকের হাতের কৌশল।

রাভেল হাসতে লাগলো। তার হাসি আমার কাছে মিছরির ছুরির মতো মনে হচ্ছিলো। আমি বললাম, যুবকের হাতের কৌশলও দেখে নাও. কে নিষেধ করছে?

রাভেল সামনে এগিয়ে আসছিল। খোদাদাদের চেহারা ভাবলেশহীন।

রাভেল আমার দিকেই আসছিল। খোদাদাদ শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললো, শাহজামাল আমাদের অতিথি।

রাভেল থমকে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে চলে গেল।

খোদাদাদ বললো, ঐ দেখো সামনে দেয়ালের উপর বাঁধা মিনারের মতো বাঁশের কঞ্চি, সেটি আমাদের লক্ষ্যস্থল। জ্যোছনা রাতে দেয়ালের উপরের বাঁশের কঞ্চি একটি ক্রুশের মতো আকাশের প্রতি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

শামা আমার হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে বললো, তুমি আমাদের অতিথি, তোমার অধিকার সবার আগে।

শামার বলার ভঙ্গিতে চাপা ব্যঙ্গ প্রকাশ পাচ্ছিলো। আমি বন্দুক ছুঁড়লাম, কিন্তু মনে মনে জানতাম লক্ষ্যভেদ করতে পারবো না। তাই হলো। বাঁশের কঞ্চি যথাস্থানে দাঁড়িয়ে রইলো।

খোদাদাদ একবার বাঁশের কঞ্চির প্রতি তাকিয়ে নিজে বন্দুক চালালো, কিন্তু সে-ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে রাভেল হাসলো।

দর্পিত ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে রাভেল বন্দুক হাতে নিল এবং এমনভাবে বন্দুক চালালো যেন কঞ্চিই শুধু নয়, একটা পাখির পালক হলেও ছিদ্র করে ফেলবে। কিন্তু বাঁশের কঞ্চি যথাস্থানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

শামা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে রাভেলের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে বললো, বলি আজ তোমার হয়েছেটা কি? কথা বলেই ঠা শব্দে নিজে কঞ্চি লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ করলো।

কঞ্চি উধাও হয়েগেল। শামা বন্দুকের নলে ফুঁ দিয়ে তা রাভেলের হাতে তুলে দিল। রাভেল বন্দুক নেয়ার ছলে কিছুক্ষণ শামার হাত ধরে রাখলো। শামা হাত টেনে নিলে বন্দুক মাটিতে পড়ে গেল। রাভেল হেসে আমাকে বললো, হাতে হাতে কুস্তি লড়বে জওয়ান?

আমি বললাম, কেন নয়, হাত দাও।

তারপর আমরা উভয়ে হাতের তালু ধরা অবস্থায় শক্তি পরীক্ষার মহড়া দিলাম। ওরা জানে না এ ব্যাপারে আমি কতোখানি দক্ষ।

খোদাদাদকে হারিয়ে দিয়ে রাভেলের সাথে শক্তি পরীক্ষা করলাম। এমনভাবে ঝটকা দিলাম যে রাভেল দশ গজ দূরে গিয়ে ছিটকে পড়লো। মারজানা হাত তালি দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো। শামা এগিয়ে এসে মারজানার গালে চড় কষে দিল। মারজানা কাঁদতে লাগলো।

আমি শামাকে বললাম, মারজানা, তোমার কি ক্ষতি করেছে?

শামা বললো, তুমি চুপ করো। মারজানার সাহায্যকারিণী হয়ে এসেছেন যেন। এক রাতের অতিথি এখনই কেমনধারা কথা বলছে। মনে হয় উনিই যেন যাযাবরের সর্দার। রাভেলের হাত থেকে নিজ হাত ছাড়িয়ে নিতে পেরে উনি যেন বিরাট কিছু করে ফেলেছেন!

খোদাদাদ হাসতে লাগলো। সামনের তাঁবুতে যে যাযাবর কাঁচিতে শান দিচ্ছিলো, সে শান দেয়া যন্ত্র এক পাশে সরিয়ে রেখে দফ্ বাজাতে লাগলো। তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরাও তার সাথে মিলে গান গাইছিল। আমরাও সেখানে গেলাম। রাভেলের তাঁবুর সবাই এসে যোগ দিল।

চতুর্থ তাঁবুতে ছিল একজন বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা। প্রজ্জ্বলিত আগুনের মিষ্টি উত্তাপের সাথে শীতল জ্যোছনায় যাযাবর নারী-পুরুষের কণ্ঠ-নিঃসৃত গান দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছিল। জ্যোছনার ঝড় একদিকে, অন্যদিকে নেশার ঝড়। বাদ্যযন্ত্রের সাথে তাল মিলিয়ে শামা নৃত্য করছিল। তার দেহ যেন তার আত্মায় বিগলিত হয়ে মিশে গিয়েছিল! নাচের সময় শামাকে আমাদের চারদিকে এখানে-ওখানে মাটিতে-আকাশে সর্বত্র দেখা যাচ্ছিল। তার কণ্ঠস্বর ছিল যেন মাটির আওয়াজ। তার নাচ ছিল প্রকৃতির নাচ। বারবার মাথার এলোমেলো চুল উড়ে শামার মুখের উপর এসে পড়ছিল। নাচের তালে তালে শামা তার চূর্ণ-কুন্তল যখন সরিয়ে দিচ্ছিলো তখন যেন বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে উঠছিল। অন্ধকার, আলো, বিদ্যুৎ, গানের সুর, বাজনা আর নাচের তালে যেন সপ্ত আকাশ আর চাঁদ-সুরুজ-নক্ষত্র মিইয়ে যাচ্ছিলো। সমগ্র সৃষ্টিজগত যেন নাচছিল। সবকিছু যেন নেচে নেচে বলছিল—দেখো এই হচ্ছে সেই নারী সেই আলোর মশাল যা কিনা নিজের করুণার মদিরে মানুষ সৃষ্টি করে, তাদের সভ্যতা সংস্কৃতিকে স্থায়িত্ব

দান করে তাদের বুকে জ্ঞান ও চরিত্রের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত এই সেই নারী, এই আরণ্যক, আলোক শিখা, ঝড়ের সংকেত আর জীবন নৃত্যের কেন্দ্র-বিন্দু।

নাচ-গানের এ মহাফিল সম্ভবতঃ ভোর পর্যন্ত চলতো যদি আমার মামা আল্লাদাদ খান এসে না পড়তেন। হঠাৎ তিনি কোথা থেকে আবির্ভূত হয়ে চিৎকার করে বললেন, ওহে হারামজাদা যাযাবর দল, পাততাড়ি গুটাও। আমাদের গ্রাম থেকে বেরিয়ে যাও—এক্ষুনি, মুহূর্তে, অন্যথায়···

শামা নাচতে নাচতে একেবারে বসে পড়লো। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ভাইয়ের প্রতি তাকালো। রাভেল এবং খোদাদাদ উভয়ে আল্লাদাদের প্রতি অগ্রসর হলো, কিন্তু তার হাতে পিস্তল দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো।

রাভেল বললো, আমরা বেদুইন, আমরা কারো ধমক সহ্য করতে জানি না। আকাশের নিচে যতো জমি আছে সবই আমাদের, যেখানে ইচ্ছা আমরা সেখানে থাকবো। যখন ইচ্ছা উঠে চলে যাব।

আল্লাদাদ বেটেখাট দেহের ডাকাত। ছোট ছোট গোঁফ। ছোট ছোট চোখ কপালের নীচে গর্তের ভেতর যেন চমকাচ্ছে। তার মুখের প্রতি তাকালেই তার ধূর্ততা, চাতুর্য আর নির্দয় স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সে রাভেলের প্রতি পিস্তল তাক করে বললো, এটা রংপুর গ্রাম নয়। এখানে হিজড়া নপুংশক বাস করে না। এটা আল্লাদাদের গ্রাম। এক গুহায় দুই বাঘ বাস করতে পারে না। আগামীকাল চুপচাপ এখান থেকে চলে যেও বলে দিচ্ছি। অন্যথায় তাঁবু জ্বালিয়ে খাক করে দেব।

আমি ক্রুদ্ধভাবে খোদাদাদকে সরিয়ে দিয়ে আল্লাদাদের সামনে বুক টান করে দাঁড়িয়ে বললাম, মামা এসব গরীব যাযাবরের সাথে লড়াই করে কি লাভ? যদি লড়তে হয় তবে আমার সাথে এসে লড়। রংপুরের লোক নাকি হিজড়া। এসো আমার সাথে মোকাবিলা করবে। এসো, আমিও প্রস্তুত।

আল্লাদাদ আমাকে দেখে বিস্মিত হলো। বললো আরে শাহজামাল,

তুমি এখানে কি করছো? এ জঙ্গলের মধ্যে তুমি আমার বাড়ীতে গেলেন না কেন? আমাকে এ কথা বলে শামা এবং মারজানার প্রতি তাকিয়ে আল্লাদাদ হেসে বললো, এসব তাঁবু এখন না জ্বালিয়ে পারা যাবে না। গাঁয়ের সব যুবক এসব যাযাবর নারীদের উপর ভেঙ্গে পড়বে।

রাভেল সামনে অগ্রসর হলো। এতে আল্লাদাদ তার পিস্তল আরো খানিকটা সামনে এগিয়ে দিল। খোদাদাদ রাভেলকে থামিয়ে দিয়ে মোলায়েম কণ্ঠে বললো, আল্লাদাদ, কাল সকালে আমরা এখান থেকে চলে যাব। আমাদের বাস এটুকু সময় দাও।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। কালবিকালে অবশ্যই যেও। যদি আমি তোমাদেরকে এখানে কালকেও দেখি তাহলে তোমাদের প্রতি কুকুর লেলিয়ে দেব। আল্লাদাদ তারপর আমাকে বললো বাড়ীতে যাচ্ছ?

আমি মাথা নাড়লাম।

—তবে কোথা থেকে আসছো? খাজনা আদায় করে? তাহলে তো কৌটা বেশ ভারী। আল্লাদাদের চোখ লোভে চকচক করে উঠলো।

আমি চুপ করে রইলাম। রাভেল এবং খোদাদাদ আমার প্রতি তাকালো। তারপর আল্লাদাদ তাদের উভয়ের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। অতঃপর স্বগত স্বরে বললো, এই শাহজামাল বড় সচেতন যুবক। আমার প্রতি তাকিয়ে ব্যঙ্গাত্মকভাবে আল্লাদাদ বললো আচ্ছা তাহলে আমি যাই। সকালে যাওয়ার আগে আমার সাথে দেখা করে যেও।

রাভেল এবং খোদাদাদ উভয়ে আল্লাদাদকে কিছু পথ এগিয়ে দিয়ে এলো। বেশ কিছুক্ষণ পর তারা ফিরে এলো। তাদের ফেরার আগেই আমি সিদ্ধান্ত পাকা করে নিলাম। টাকার কৌটা বের করে শামার দিকে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছুক হয়ে বললাম, সকালে তোমার কাছ থেকে নেব।

শামা কৌটা দেখে হেসে বললো, আমি এটা কাছ রাখতে পারবো না। এটা তোমার জিনিস। এর সংরক্ষণ তোমার দায়িত্ব।

আমি বললাম, আমি তোমার অতিথি।

শামা বললো, আমি তোমাকে ডাকিনি।

আমি বললাম, ভয় পাচ্ছ?

আমার হাত থেকে কৌটা ছিনিয়ে নিয়ে শামা বললো, পুরুষ নিজের বন্দুক দিয়ে নিজের তাঁবু, নিজের নারী এবং নিজেকে রক্ষা করে। কিন্তু তোমরা বাস করো মাটির ঘরে। তোমরা এসব কথা কি বুঝবে?

আমি মাথার কাছে বন্দুক রেখে বিছানায় সটান শুয়ে পড়ে বললাম, তুমি বকবক করো। আমার ঘুম পাচ্ছে। এ কথা বলে আমি দু'চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

বেশ কিছু সময় পর আল্লাদাদকে এগিয়ে দিয়ে রাভেল এবং খোদাদাদ ফিরে এলো।

তারপর তারা তাঁবুর বাইরে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন আলাপ করছিল। আমি চোখ বুঁজে ঘুমের ভান করে তাদের আলাপ-আলোচনা শুনছিলাম। ঘুমের ঘোরে আমি বন্দুকের উপর হাত রাখলাম।

রাভেল এবং খোদাদাদ শামাকে গাল-মন্দ দিচ্ছিলো। শামা বলছিল—তার পক্ষে এখন আর কিছুই করা সম্ভব নয়, কারণ সে কথা দিয়েছে। রাভেল শামাকে গাল দিচ্ছিলো, শামাও প্রত্যুত্তরে গাল দিচ্ছিলো। খোদাদাদ হঠাৎ বললো, আমরা ওকে খুন করে জঙ্গলের মধ্যে পুঁতে রাখতে পারি। কিন্তু শামা এ প্রস্তাবে একমত হলো না। সে বললো, আল্লাদাদের ভরসা কি? হয়তো সে তোমাদের আগামীকালই ফাঁসিতে চড়াবে। তা'ছাড়া যাযাবররা কোথাও কি কখনো কাউকে হত্যা করেছে? চুরি-ডাকাতি করা সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু হত্যা তো যাযাবররা আজ পর্যন্ত কখনো করেনি। তবে কি স্বজাতির মুখে চুন-কালি লাগাবে? শেষ পর্যন্ত খোদাদাদ এবং রাভেলকে শামার বক্তব্যের সাথে একমত হতে হলো।

খোদাদাদ এবং শামা তাঁবুর ভেতর এসে আগুন নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। মারজানা তখন গভীর ঘুমে অচেতন। শামাও তার কাছে এসে শুয়ে পড়লো।

খোদাদাদ আমার কাছে এসে শয়ন করলো। আমি শামা এবং

খোদাদাদের মাঝখানে শায়িত। তাঁবুর দরজা কেউ বন্ধ করেনি। বাতাসের দোলায় দরজার পর্দা ফর্ ফর্ করে দুলছিল, এতে চাঁদের আলো তাঁবুর ভেতরেও আলোকিত করছিল। জালিম নামের কুকুর তাঁবুর দরজায় দাঁড়িয়ে শূন্যে নাসিকা তুলে অদৃশ্য শত্রুর ঘ্রাণ নিচ্ছিলো। কারো পায়ের হালকা চাপ শুনলেও সে ঘেউ ঘেউ করছিল। আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান করে জেগে রইলাম। আমার এক পাশে শামা, অন্য পাশে খোদাদাদ ঘুমুচ্ছে।

খোদাদাদ অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো। তার নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছিলো। ভালভাবে লক্ষ্য করে বুঝলাম, এটা ঘুমের ভান নয়, খোদাদাদ আসলেই ঘুমুচ্ছে। আমি পাশ ফিরে শামার প্রতি তাকালাম। সাদা জ্যোছনা তার চেহারার একাংশে, মাথার চুলে এবং থুতনিতে আছড়ে পড়েছে।

শামা আমার এতো কাছে ছিল যে হাত বাড়ালেই আমি থুতনি ছুঁতে পারছিলাম। শামার থুতনি স্পর্শ করার, তার রক্তিম মোলায়েম কপোলে চুমু খাওয়ার এবং তার দেহ জড়িয়ে ধরে পিষে ফেলার ঝড়ো প্রেরণা আমার হৃদয়কে তোলপাড় করে দিচ্ছিলো। আমি তার নিশ্বাসের আওয়াজ শুনতে চাচ্ছিলাম না। এ কারণে কানে আঙ্গুল গুঁজে দিলাম। কিন্তু হৃদয়ের তরঙ্গদোলা রক্তের প্রবাহ বাড়িয়ে দিচ্ছিলো, দেহের পরতে পরতে শুধু একটি আওয়াজ—শামাকে পিষে ফেলো, শামাকে পিষে ফেলো। আমি ধীরে ধীরে শামার প্রতি অগ্রসর হলাম। এক ফাঁকে খোদাদাদের প্রতিও তাকালাম। খোদাদাদ অচেতনভাবে ঘুমুচ্ছে। হালকা স্বরে তার নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছে। শামার বাম হাতের আঙ্গুলের উপর আমি নিজের হাত রাখলাম। শামার আঙ্গুল স্পন্দনহীন। তারপর আমি তার মোলায়েম থুতনি স্পর্শ করলাম। এতে আমার শিরা-উপশিরায় লাখো অগ্নিশিখা যেন তড়পাতে লাগলো। ঝড়ের তরঙ্গ দোলা দেহের উপকূলে এসে আছড়ে পড়লো। কানের ভেতর গেল একই রকম গীতি-ধ্বনি—শামাকে পিষে ফেল, শামাকে পিষে ফেল। আমি পুনরায়

খোদাদাদের প্রতি তাকালাম। তারপর মারজানার প্রতি তাকালাম। মারজানা এদিকে পেছন ফিরে একইভাবে ঘুমুচ্ছে।

শামার প্রতি আমি আরো কিছুটা এগোলাম। পরিবেশে মিষ্টি সঙ্গীত ধ্বনির মৃদু ফিস্ ফিস্ শব্দ, রহস্যময় সুরের রেশ আর আনন্দধারা। আমি সে আনন্দধারায় সাঁতার কেটে শামার খুব কাছে চলে গেলাম। তারপর আমি নিজের হাতের আঙ্গুল শামার হাতের আঙ্গুলের ভেতর গুঁজে দিয়ে জোরে চাপ দিলাম। মনে মনে বললাম, জাগো, জাগো হে অন্তবিহীন সৌন্দর্যের আধার শামা শাবিস্তান।

শামা জাগলো না। তার দু'চোখ একইভাবে বোজা, কিন্তু আমার হাতে তার হাতের এমন চাপ অনুভব করলাম যে, যদি পুরুষ না হতাম তাহলে যন্ত্রণার তীব্রতায় আর্তনাদ করে উঠতাম। অনড় নিস্পন্দভাবে নীরবে শামা আমার হাতের আঙ্গুল মোচড়াচ্ছিল। আমি তার হাতের মোচড় প্রতিরোধ করতে করতে মনে মনে ভাবলাম, এ যুবতীর আঙ্গুলে এতো শক্তি, এতো দৃঢ়তা, এতো স্থিতিস্থাপকতা এলো কোথা থেকে? শামার ফুলের মতো দেহে ইস্পাতের কাঠিন্য কোথায় লুকিয়ে ছিল? আমি শামার হাতের কবল থেকে নিজের হাত ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই তাতে সফল হলাম না। যন্ত্রণা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় আমি পার্শ্ব পরিবর্তন করতে বাধ্য হলাম। এবার আমার পিঠ তার দিকে, কিন্তু আমার হাত তার হাতের আঙ্গুলের কবজায় আবদ্ধ।

শামা আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, হাতের শক্তি পরীক্ষা করতে চাও?

আমি বললাম, তুমি নারী নও, ডাইনী।

শামা মৃদু স্বরে হেসে বললো, কুশতি লড়বে?

আমি বললাম, দৈত্যের সন্তান, শূয়রণী।

সে বললো, মাহিয়া (এক ধরনের গান) শুনবে?

আমি বললাম, আমার হাত ছেড়ে দাও, তোমার সাত পুরুষের উপর অভিশাপ।

সে বললো, আমি মাহিয়ার ভক্ত, মাহিয়া খুবই পছন্দ করি। নদী-তীরের প্রান্তরে মাহিয়ার শব্দ যখন শুনি আহা! আহা!

—চুপ করো! আমি বললাম, কেউ যদি শুনে কি যে হবে।

—আমি কাউকে ভয় করিনে। আচ্ছা, এবার মাহিয়া শোনো। এ কথা বলে শামা অতি মৃদুকণ্ঠে মাহিয়া গাইতে লাগলো। তার কণ্ঠস্বরে হাসি, কৌতুক, উচ্ছাস আর দুষ্টুমীর মিলিত কোরাস।.....

আমি কিছুই বুঝলাম না। তবে গানের কথা বুঝতে না পারলেও সুর ঝংকার বেশ শ্রুতিমধুর মনে হচ্ছিলো। কিন্তু মাহিয়া গানের প্রতি লক্ষ্য না করে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, হারামজাদী! এ কথা বলার সাথে সাথে নিজের হাত ছাড়াতে সচেষ্ট হলাম।

সে বললো শামা যাযাবরের মেয়ে। সে কোন মাটির ঘরে থাকা কৃষাণের মেয়ে নয় যে তহশীলদারের ছেলেকে দেখেই তার প্রেমে পড়ে যাবে এবং নিজের জীবনের সমুদয় সম্পদ চুপচাপ তাকে সোপর্দ করবে। তোমরা সভ্য মানুষেরা অরণ্যচারীদের চরিত্রের কি জানবে?

এ কথা বলে শামা আমার আঙ্গুলে পুনরায় চাপ সৃষ্টি করলো। উহ্, সে যে কি যন্ত্রণা, কি তীব্র বেদনা। ক্রমেই চাপ বাড়ছিল। আমার হাত শামার হাতের কবজায় ক্রমে দৃঢ়ভাবে সংস্থিত হচ্ছিলো। হঠাৎ মনে হলো আমি তাঁবুতে নয় বরং জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে আছি, একটি বন্য জন্তু আমার বাহু নিজের কবজায় নিয়ে গেছে। যদি আমি নিজকে তার কবজা থেকে মুক্ত না করি, তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই এ বিজন জঙ্গলে আমার হাড় পড়ে থাকবে। যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো বাহু ভেঙ্গে যাবে। ছটফট করে আদিম শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় আমি শামার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়ালাম। কিন্তু হাত ছাড়াতে গিয়ে আমার হাত চপেটাঘাতের মতো চটাং করে শামার নরম গালে গিয়ে আঘাত করলো। চটাং করে শব্দ হলো। শামার মুখ থেকে চাপা আর্তনাদ ধ্বনিত হলো। হঠাৎ খোদাদাদ ধড়মড় করে উঠে বসে গেল।

শামা মিছে মিছে জেগে যাওয়ার ভঙ্গি করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো,

কি হয়েছে পথিক ?

—কিছু না। আমি বললাম।

খোদাদাদ বললো, সম্ভবতঃ আমি একটা চিৎকার শুনেছি।

—সম্ভবতঃ বেচারা পথিক ভয় পেয়ে গেছে। খুব খারাপ স্বপ্ন ছিল কি ? শামা বললো।

আমার সারা দেহের রক্ত গরম হয়ে উঠলো, কিন্তু চুপ করে রইলাম।

—কি হয়েছে ? মারজানা চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

—কিছু না। বেচারা পরদেশী ভয় পেয়ে গেছে। কোন কোন স্বপ্ন বড় ভয়ানক হয়ে থাকে। শামা মমতাসিক্ত কণ্ঠে বললো।

—শুয়ে পড়ো। খোদাদাদ এ কথা বলে পাশ ফিরে শয়ন করলো। দীর্ঘ সময় নীরবতা বিরাজ করলো। তারপর শামা ধীরে ধীরে নিজের জায়গা থেকে উঠে তাঁবুর পর্দা তুলে বাইরে চলে গেল। খানিক পর বন্দুক হাতে আমিও বাইরে বেরোলাম। চাঁদ প্রান্তরের মাঝখানে চমকাচ্ছে আর শামা নদীতীরে বসে মুখ ধুচ্ছে।

আমি তার পাশে গিয়ে বললাম, মাঝরাতে মুখ ধুয়ে কি হবে ?

শামা চোখ তুলে আমার প্রতি তাকালো। আমি লক্ষ্য করলাম তার দাঁত থেকে রক্ত ঝরছে, ঠোঁটের কোণে ক্ষতচিহ্ন। সম্ভবতঃ ওখানেই আমার হাত পড়েছে। শামার পাশে বসে অঞ্জলি ভরে পানি তুলে আমি তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে রক্ত ঝরা বন্ধ হলো। ক্ষতচিহ্নের জায়গায় দু'টি রক্তিম শীর্ণ রেখা অবশিষ্ট রইলো। ইয়াকূত পাথরের মতো সুন্দর সে অধরে চুমু খাওয়ার জন্য আমার অধর অস্থির হয়ে উঠলো, কিন্তু দাঁতে অধর চেপে আমি সে ইচ্ছে দমন করলাম। হঠাৎ অবাক দৃষ্টিতে গুলীবিদ্ধ বাঁশের কঞ্চিটি খুঁজে ফিরলাম। কিন্তু খুঁজে পেলাম না। এখন কোন হৈচৈ নেই, গুলীর ঠা-ঠা শব্দ নেই, রাভেলের রুক্ষ কণ্ঠস্বর নেই, দফ-এর বাজনার সাথে সঙ্গীতের ঐক্যতান নেই, শামার নৃত্য নেই, অথচ শামা মূর্তিমতী সৌন্দর্যের আধার হয়ে আমার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখের রহস্যময় গভীরতায় চাঁদ চম-

কাচ্ছে। প্রান্তরের সাঙ্গীতিকতা নিঃশেষ হয়ে নীরবতা ফিরে এসেছে। আমরা উভয়ে সেই অন্তহীন নীরবতার মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে একে অন্যের প্রতি তাকিয়ে আছি। তাকিয়ে কি দেখছি ? একে অন্যকে চিনে নিচ্ছি ? কিছু কি খুঁজে ফিরছি ? মনে হলো যেন দু'টি আত্মা সামনে অগ্রসর হচ্ছে এবং নিজের নাজুক আঙ্গুল দিয়ে একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার চোখের পলক, কপোল আর তার থুতনি চিনে নিচ্ছে। আমি চিনি, ওগো আমি তোমায়ে চিনি। আমরা একই স্পন্দনের তাল, একই লয়ের গুঞ্জন, একই সত্যের প্রতিচ্ছবি। আজ লাখো বছর পর আমরা মিলিত হয়েছি। দু'টি বিন্দু, দু'টি আত্মা, বিরাট বিপুলা পৃথিবীর গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছি। এতোদিন নিজস্ব ক্ষুদ্র বলয়ে ঘুরপাক খেয়েছি আর আজ হঠাৎ চলতে চলতে একে অন্যের সামনে এসে পড়েছি। যেন দু'টি নক্ষত্র, ভবঘুরে নক্ষত্র এক মুহূর্তের জন্য, শুধু এক মুহূর্তের জন্য একে অন্যের সামনে এসে পড়েছে। এই একটি মুহূর্ত অন্তহীন, চির-ন্তন, অনিঃশেষিত। এই মুহূর্তে সে আমার মধ্যে তোমার মধ্যে নিজের মধ্যে পরিপূর্ণ সত্তায় বিকশিত, পরমুহূর্তে আবার আমার জন্য অপরিচিত। সে তাঁবুর প্রতি পা বাড়ালে আমার জন্য সে মুহূর্ত নিঃশেষ হয়ে গেল। আলোকপিণ্ড নিভে গেল। নীরবতা পালিয়ে গেল। রাত্রির কোলাহল ফিরে এলো। এখন দেয়ালে বাতাস কাতরাচ্ছে। জঙ্গলে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। নদী খিল খিল করে হাসছে। চাঁদ যে হাসছে এটা জানা যাচ্ছে। চারদিকে শোরগোল কলরোল ধ্বনিত হচ্ছে। এমন কি শামার পায়ের শব্দ, যাযাবরদের নিঃশ্বাস, তাঁবুর পর্দার ফরফর শব্দও শোনা যাচ্ছিলো। এ মুহূর্তের আগে সব-কিছু ছিল নীরব অথচ এখন সবই সরব হয়ে উঠেছে, চিৎকার করছে এবং মস্তিষ্কে পতঙ্গের মত প্রবেশ করছে। এ রকমই হয়ে থাকে। কখনো একটি মুহূর্ত অন্য মুহূর্তের মতো হয় না। কখনই হয় না। এখন জীবনের বিন্যাস, ধারাক্রম, ভারসাম্য এক রকম, পরক্ষণেই আবার অন্য রকম। এমন হয় কেন ? এক রকম কেন হয় না ? কেন হয় না ?

তাঁবুর পর্দা তুলে শামা ভেতরে চলে গেল। আমি তাঁবুর বাইরে

দাঁড়িয়ে রইলাম। খানিক পর লোম-ওঠা কুকুরটির পাশে এক খণ্ড পাথরের উপর বসে পড়লাম। কুকুর তার গরম জিহ্বা দিয়ে আমার হাতের কবজি চাটতে লাগলো। আমি তার পিঠ চাপড়ে তাকে আদর করছিলাম। কুকুরকে আদর জানিয়ে আসলে আমি নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এলো। আমি সেখানেই পাথরের উপর নক্ষত্রের ছায়াতলে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি নক্ষত্র হারিয়ে গেছে, শুভ্র প্রভাত আবির্ভূত হয়েছে।

সামনের নদীর তীর ঘেঁষে শামা আমার খচ্চরের পিঠে এক বোঝা জ্বালানি কাঠ নিয়ে আসছে। আমার কাছে এসে থেমে গিয়ে, খচ্চরের পিঠ থেকে কাঠের বোঝা নামিয়ে তাঁবুর সামনে রেখে দিল। তাঁবুর দিকে পা বাড়িয়ে সে ভেতরে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, নাও, আমার কৌটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি যাচ্ছি।

এ কথা বলে আমি খচ্চরের লাগাম নিজের হাতে ধরলাম।

—কিসের কৌটা? শামা স্নিগ্ধ মোলায়েম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

—রাতে তোমাকে আমি যেটা দিয়েছিলাম।

—রাতে দিয়েছিলে? আমাকে? একি বলছো তুমি?

—রসিকতা রাখো। এটা রসিকতার সময় নয়। কৌটা বের করো। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

খোদাদাদ এবং রাভেল উভয়ে সামনের দিক থেকে এদিকে আসছিল।

ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে খোদাদাদ বললো, কোন কৌটার কথা বলছো তোমরা?

আমি চিৎকার করে বললাম, রাতের বেলা ওকে আমি দিয়েছিলাম। মারজানার সামনেই তো দিয়েছিলাম। কোথায় মারজানা, ওকে ডাকো।

শামা বললো, মারজানা এখানে নেই। সে বনে গেছে। এখনো ফেরেনি। কাঠ কেটে ফিরবে।

—সেই কৌটা তুমি ওকে দিয়েছো কেন? রাভেল হেসে জিজ্ঞেস করলো।

—আমি ভেবেছি ওর কাছে নিরাপদে এবং হেফাজতে থাকবে।

—আচ্ছা, তবে কি তুমি আমাদের প্রতারক ঠগ মনে করো? রাতভর আমরা তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি, ডাকাতের হাতে খুন হওয়া থেকে রক্ষা করেছি আর তুমি এখন আমাদেরকে চোর বলছো?

শামা রাভেলের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে আমাকে বললো, এক্ষুণি চলে যাও, এ মুহূর্তে—অন্যথায়-----

আমি শামার প্রতি, রাভেলের প্রতি এবং খোদাদাদের প্রতি তাকালাম। তারপর খচ্চরের পিঠে চড়ে বসলাম।

আজ পথ একাকী, নিঃসঙ্গ। আমিও একা, নিঃসঙ্গ। আমার আশেপাশের প্রতিটি জিনিস একাকী। টাকা ভরা কৌটা হারিয়ে ফেলার দুঃখ নেই, কিন্তু তবু কি জিনিস হারানোর দুঃখে মন এ রকম মুষড়ে পড়েছে? মন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে আছে। মস্তিষ্কে অদ্ভুত এক ভয়ের অনুভূতি। অজানা উদ্বেগ ছেয়ে আছে। সে উদ্বেগ মুছে ফেলা সম্ভব নয়। শামার প্রতি যাযাবরদের প্রতি, নিজের প্রতি, ধীরগতিতে চলা খচ্চরের প্রতি কোন অভিযোগ নেই, কোন রাগ নেই। একটা হালকা লাজুক অন্তর্বিহীন উদাসীনতা চারদিকে ছেয়ে আছে। খচ্চর ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। একটি খরগোস দ্রুত আমার সামনে দিয়ে ছুটে গেল। একটি গাছের নীচে শৃগালের ধূসর বর্ণের লেজ দেখতে পেলাম। কিন্তু বন্দুকের প্রতি আমার হাত অগ্রসর হলো না। এক জায়গায় শুকনো গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ওখান থেকেই মেঠোপথ নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। কিন্তু আজ আমার এটাও মনে হয়নি যে মেঠোপথ গতি পরিবর্তন করেছে। বরং মনে হচ্ছিল এই মেঠোপথ একইভাবে এদিকে একই লক্ষ্যে চলে গেছে। মঞ্জিল নেই। আমি তন্দ্রায় ঢুলতে থাকলাম।

হঠাৎ জেগে গেলাম। কে যেন খোঁচা দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দিল। বললো, পথিক! নীচে নামো। শামা বললো।

আমি খচ্চরের পিঠ থেকে নীচে নেমে উভয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। আমি তাকে এটা জিজ্ঞেস করলাম না যে, তুমি কেন এসেছো?

বাস, আমরা উভয়ে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। একটা ঘন বন-জঙ্গলে ঘেরা এলাকায় আমরা দু'জন থেমে গেলাম। এখানে দু'টি পথ দু'দিকে চলে গেছে। আঙ্গুর গাছ সহ নানা ফলের ও ফুলের গাছে প্রস্ফুটিত ফুলে-ফলে এলাকাটি সুশোভিত। এ জায়গা থেকে চমনকোট এবং রংপুরের জনপদ প্রত্যক্ষ করা যায়। দু'দিকে দু'টি জনপদ! মাঝখানে এসে দু'টি জনপদ মিলিত হয়েছে। ছবির মতো সুন্দর সুশোভন এ প্রান্তরের পাশে নদীতে কাকচক্ষু জল টলমল করছে, সূর্যালোকে চিক চিক করছে।

আমি শামার প্রতি তাকালাম।

কামিজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে কৌটা বের করে শামা আমার হাতে দিল। আমি অবাক দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকিয়ে রইলাম। তার বিক্ষত অধরের উপর দৃষ্টি আটকে গেল। ইয়াকুতী রং-এর রগ, লাজুক মিহিন অধর প্রান্ত—আমি তার চেহারার উপর ঝুঁকে পড়লাম।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শান্তকণ্ঠে শামা বললো, আমাকে বিয়ে করবে?

—বিয়ে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

চুপচাপ সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

—বিয়ে? আমি ধীরস্বরে বললাম, তুমি—তুমি আমার গাঁয়ে চলো। তারপর আমি তোমাকে বিয়ে করবো।

—তোমার গাঁয়ে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ যে রংপুরে।

—কিন্তু আমি গাঁয়ে গিয়ে কি করবো? অবাক কণ্ঠে শামা বললো।

—আমি তহশীলদারের ছেলে। আমি গর্বিত ভঙ্গিতে বললাম, ওখানে আমার সাজানো ঘর রয়েছে। জমি, পশুপাল, চাকর-বাকর, অর্থ-সম্পদ রয়েছে। আর রয়েছে—আর রয়েছে···আমি থেমে গেলাম। শামা বললো, আমি চাই তুমি আমার সাথে চলো।

—তোমার সাথে? কোথায়?

—ধরনকোটে আমার গোত্রে. সেখানে আমার মায়ের গোত্র রয়েছে। আমার বাবা আমার মাকে ছেড়ে দিয়েছে! ধরনকোটে ইদানীং বরফ পড়ছে। চারদিকে সাদা সাদা বরফ।

শামার আয়নাক চোখ চিকমিক করতে লাগলো। দু'চোখে খুশীর ঝিলিক। দৃঢ়ভাবে আমার হাত ধরে সে বললো, সেখানে আমরা দু'জনে একটা তাঁবুতে থাকবো। তোমার ইংরেজী বন্দুক দিয়ে খুব ভালো ভালো শিকার করবো। তুমি—তুমি হবে আমার গোত্রের সর্দার। রাতে আমি দফ-এর সুরে তাল মিলিয়ে নাচবো। তুমি তো আমার নাচ দেখেছো। শামা তার মৃণাল বাহু স্পন্দিত করে আমার সামনে দাঁড়ালো।

আমি শামার গোত্রের প্রতি তাকালাম। চারদিকে চেয়ে থাকা বরফের প্রতি তাকালাম, দফ দেখলাম, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন তাঁবু দেখলাম, পুরনো ধানের গন্ধ ভেসে আসা বিছানা দেখলাম। হঠাৎ নিজের অজ্ঞাতেই বলে ফেললাম, কিন্তু শামা, আমার ক্ষেতি-বাড়ী, আমার ঘর, আমার অর্থ-সম্পদ, সাজ-সরঞ্জাম, আত্মীয়-স্বজন—এসব ছেড়ে আমি কি করে বেঁচে থাকবো?

শামা সরল ভাবে বললো, বেঁচে থাকার জন্য এই মুক্ত উদার আকাশ আর মাটি কি যথেষ্ট নয়? একটা তাঁবু, একটা বন্দুক আর সমব্যথী একজনের সান্নিধ্য কি যথেষ্ট নয়?

—তুমি বুঝতে পারছো না—তুমি···আমি কি ভাবে বলবো যে, তুমি যাযাবর, তুমি·····

হঠাৎ শামার দু'চোখের আলো নিষ্প্রভ হয়ে গেল। তার চোখের চমক আর সজীবতা হারিয়ে গেল। ধীরে ধীরে আমার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে সে থেমে থেমে বললো, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছি। তুমি সেই লোক নও।

—কোন লোক?

—যেতে দাও, সে তুমি বুঝবে না।

—আমি দুঃখিত, আমি·····

শামা আমাকে শেষ করতে না দিয়েই বললো, এখন আমি ধরন-কোটেই যেতে চাই। আমি আর আমার ভাইয়ের কাছে যাবো না। রাভেলকে এ মুখ দেখাবো না। আজ থেকে মারজানা আমার জন্য

মরে গেছে। তুমি কি এ খচ্চরটা আমাকে দেবে? হে অচেনা লোক, আমার পথ অনেক দীর্ঘ।

পথ অনেক দীর্ঘ। সফর গন্তব্যবিহীন। আমি ভাবলাম—লাখ লাখ বছর পর দু'টি প্রোজ্জ্বল নক্ষত্র মুহূর্তের জন্য একে অন্যের মুখোমুখি হয়, তারপর আবার উভয়ে আলাদা হয়ে পথ পরিক্রমণ করতে থাকে। এক মুহূর্ত, দু'মুহূর্ত—তারপরই উভয়ের মধ্যে সাত সমুদ্রের ব্যবধান। এক মুহূর্ত মানুষের অরণ্যে উভয়ের সংযোগ, তারপরই সে সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায় চিরতরে।

—শামা! আমি ধীরকণ্ঠে বললাম, একটা মুহূর্ত কখনোই অন্য মুহূর্তের মতো হয় না।

—কি বলছো তুমি? শামার চোখে বিস্ময়।

—যেতে দাও, তুমি বুঝবে না।

খচ্চরের লাগাম আমি শামার হাতে তুলে দিলাম। পাতলা লাল জিভ বের করে—অধর প্রান্তে ক্ষতচিহ্ন—শামা আমার প্রতি তাকালো। পর মুহূর্তে আমার প্রতি না তাকিয়েই বললো, আচ্ছা, খোদা হাফেজ! এ কথা বলে আমার জবাবের প্রতীক্ষা না করেই খচ্চর ছুটিয়ে শামা ধরনকোটের পথ ধরলো।

আমি দীর্ঘ সময় দু'টি পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটি পথ শামার গোত্র ধরনকোটের দিকে গেছে আর একটি পথ আমার গাঁয়ের দিকে গেছে। ধরনকোটের পথে দু'কদম যাওয়ার পর পেছন ফিরে আমি নিজের গাঁয়ের দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়ালাম।

———

মোবি

ওহিওর অধিবাসী মোবি সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার আগে নিউইয়র্কে কেরানির কাজ করতো। তার মাথার চুল ছিল ঘন এবং সোনালী। একই রকম রং ছিল তার চেহারারও, যেন সেপ্টেম্বর মাসের সেব ফলের আবরণ। মোবির উচ্চতা ছ'ফুটের চেয়ে কিছু বেশী। তার হাসির অসংকোচ প্রকাশ শিশুর হাসির মতোই পবিত্র। নাকের নীচে একটা ছোট তিল। এ কালো তিল থাকার কারণে মোবির চেহারায় যৌবনের সকল মাধুর্য থাকা সত্ত্বেও তাকে মনে হতো আত্মভোলা শিশু। তাকে মনে হয় এমন শিশু যে কিনা কলমের নিব দিয়ে নাকের নীচে কালি লাগিয়েছে। এ কারণে পারভেজ তাকে 'নোংরা মোবি' বলে সম্বোধন করতো এবং এতে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে হতে ভদ্রোচিত হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যেত।

পারভেজ এবং শামের সাথে মোবি ওদের ষ্টুডিওতে পরিচিত হয়েছিল। মোবি আসাম এবং বাংলা থেকে ফিরে এখানে কয়েক মাসের জন্যে এসেছিল। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে তাকে প্রায়ই সেনা-ছাউনির রাস্তায় একাকী ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। কিন্তু ইদানীং সেনা-ছাউনির রাস্তায় সাইকেল চালাতে, সিটি বাজাতে বা একাকী ঘোরাফেরা করতে তার ভাল লাগতো না। এসবের প্রতি তার রীতিমত ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। ছাউনির সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যবসায়িক মনোভাবের লোকদেরও তার পছন্দ হতো না। সিনেমা হলেও সাধারণতঃ হলিউডের যেসব ছবি প্রদর্শিত হতো সেসব ছবিতে নগ্ন উরুর অবাধ প্রদর্শন দোষণীয় মনে করা হতো না। সিনেমা হলের ব্যবস্থাপকেরা কি তা'হলে সেনাবাহিনীর জওয়ানদের এমন কুরুচিপূর্ণ মনোভাবের অধিকারী বলে ধরে নিয়েছে যে এসব ছবিতে তারা খুবই উৎসাহ অনুভব করে? সৈন্যরা কি মেয়েদের উষ্ণ মাংস ছাড়া অন্য কিছু দেখতে চায় না? এসব ভেবে

মোবির খুব রাগ হতো, সে কয়েক সপ্তাহ যাবত সিনেমা হলের দিকে পা বাড়াতো না। সিনেমার প্রতি যে তার ঘৃণা ছিল তাও কিন্তু নয়, সে সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ কষাঘাত রয়েছে হলিউডের এমন সব ছবি দেখতে চাইতো। কিন্তু এ ধরনের ছবি এখানে কালে-ভদ্রেই এসে থাকে। প্রতিবারই নগ্ন উরু, স্পন্দিত নিতম্ব, কম্পিত কোমর, কবুতরের মতো উচ্চয়নশীল স্তন যুগল, মারদাঙ্গা আর জবরজঙ্গ প্রকৃতির নৃত্য-কলা। হে ঈশ্বর, এসব তেলেসমাতি থেকে কবে মুক্তি পাওয়া যাবে?

এ কারণে মোবি সাইকেলে আরোহণ করে নিঃসঙ্গভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ষ্টুডিওর সামনে দিয়ে বেশ কয়েকবার যাওয়া আসা করতে গিয়ে ষ্টুডিওতে প্রবেশ করতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু যায়নি। কি হবে ওখানে গিয়ে? বারবার তার মন চাইতো ষ্টুডিওতে প্রবেশ করতে, সে ইচ্ছে হতো কবরের মতো গভীর।

সেদিন সে নিতান্ত উদ্বিগ্ন, অস্থির, আত্মসমাহিত নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। ষ্টুডিওর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় এক নজর ভেতরে তাকালো। তৃতীয়বার ঘুরে-ফিরে ষ্টুডিওর সামনে দিয়ে বাসায় ফেরার সময় সে ভাবলো, অসুবিধা কি, ভারতীয়রা যদিও নির্ভরযোগ্য জাতি নয়—মূর্খ, কালো, নিষ্কর্মা, হীনমন্যতার শিকার, কিন্তু তবুও তারা চলচ্চিত্র নির্মাণ করে। ওদের নির্মিত ছায়াছবি টেকনিকের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ বটে, কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পে হলিউডের পরেই ভারতের স্থান। ছবি নির্মাণের সংখ্যার দিক থেকেও এটা স্বীকার্য। এমন কেন হয়? আবার সে ভাবলো—না, ওদের সাথে মেলামেশা করা উচিত হবে না।

সে শুনেছে—এদেশের লোক বিশ্বাসহন্তা, অবিশ্বস্ত এবং দরিদ্র। অর্থাৎ, কালো এবং সাদা ফিল্মী ছবি আপনা-আপনি প্রাকৃতিক রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে এমন দেখা যাবে। কেমুর ইহুদী মস্তিষ্কের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এ সমস্যার সমাধান উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছিল। ইদানীং সে মোবি বিনিয়োজিত মূল-ধনের সাহায্যে এ আবিষ্কারকে পেটেন্ট করছে। কেমু লিখেছিল—মোবি যেন ভারতীয় ষ্টুডিও এবং সিনেমা মালিকদের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করে। অসুবিধা কি? মোবি যদি ভারতের ধাঙ্গড়, বাবুর্চি, বেয়ারা

ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলতে পারে তা'হলে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে কেন কথা বলতে পারবে না?

সাইকেল ঘুরিয়ে মোবি ষ্টুডিওর দরজার দিকে অগ্রসর হলো। দরজায় তাকে থামতে হলো, কারণ পাঠান চৌকিদার দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢোকার অনুমতিপত্র না দেখালে ভেতরে যেতে দিতে পারে না বলে চৌকিদার অক্ষমতা প্রকাশ করলো। মোবির কাছে অনুমতিপত্র আসবে কোথা থেকে? কিন্তু ভারতীয় চৌকিদারের এতো সাহস? সাইকেল সামনে বাড়িয়ে মোবি বললো, আমাকে ভেতরে যেতে দাও। আমি ষ্টুডিও দেখতে চাই। তার কথার ভঙ্গিতে ছিল আদেশের সুর, গর্ব এবং আত্মম্ভরিতার অভিব্যক্তি। কিন্তু তাতে চৌকিদার এতটুকু প্রভাবিত হলো না। ফলে কথা কাটাকাটি হতে লাগলো। বেশ কিছু পথচারী দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিল।

পারভেজ ষ্টুডিওর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট পান করছিল। এক-জন সৈন্যকে বেশ কিছু লোক ঘিরে রয়েছে দেখে কৌতূহলবশতঃ সে দরজার দিকে পা বাড়ালো।

—কি ব্যাপার লালা? চৌকিদারকে সে জিজ্ঞেস করলো।

কান্দাহারের আনারের মতো লাল টকটক করা চেহারার চৌকিদার উচ্চস্বরে বললো, সাহেব ভেতরে যাবেন। আমি বলছি তোমার কাগজ কোথায়? সাহেবের কাছে কাগজ নেই। আমি তাকে কি করে ভেতরে যেতে দেব?

মোবি পারভেজকে বললো, এ চৌকিদার বড় বেতমিজ!

পারভেজ শুনে বললো, স্বাধীন দেশের লোক কিনা, তাই এখনো গোলামী শেখেনি।

পারভেজ পাঠান চৌকিদারকে ভেতরে যাওয়ার অনুমতিপত্র লিখে দিল এবং মোবিকে ভেতরে আহ্বান জানালো।

পাঠান কাগজ হাতে পেয়ে বিড় বিড় করে বললো, আমি কান্দা-

হারের পাঠান। আমি কাউকে ভয় করি না। আমি কাবুল থেকে এসেছি। আমি আমাদের দেশে সাহেব দূরে থাক, সাহেবের রেল গাড়ীও প্রবেশ করতে দেব না। কারণ রেলগাড়ী এলে তো সাহেবও আসবে। তোমরা ভারতীয়রা বড্ড বেকুব।

—এসব রাবিশ কি বলছে? মোবি পারভেজকে জিজ্ঞেস করলো।

পারভেজ বুঝিয়ে বললে মোবি হাসতে হাসতে বললো, আমি নিজের হাত সংযত করে ভালোই করেছি। আমি তো আরো চেয়েছিলাম যে, একটা চড় লাগিয়ে দিই। অবশ্য আমাকে এটা বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন অবস্থায় কখনোই কোন ভারতীয়কে চড়-চাপড় মারা যাবে না।

পারভেজ বললো, হ্যাঁ, ভালোই হয়েছে। কারণ সে ভারতীয় নয়, আফগানী।

—আফগানী? উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? মোবি জিজ্ঞেস করলো।

মোবির জিজ্ঞাসার জবাবে পারভেজ বললো, ভারতীয় যদি চড় খেতো তাহলে সারাদিন তোমার জুতো সাফ করতো, বয়ে বেড়াতো, তারপর বিকেলে সালাম জানিয়ে বখশিস দাবী করতো। কিন্তু এই চৌকিদার হচ্ছে আফগানী। একজন আফগানী এবং একজন ভারতীয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আফগানীর কাছে থাকে ছোরা আর ভারতীয়ের কাছে থাকে সালাম।

মোবি হেসে বললো, আমি তোমার সাথে রাজনীতি আলোচনা করতে চাই না, কিন্তু ষ্টুডিওর নিরাপত্তার জন্যে একজন আফগানীকে কেন নিযুক্ত করেছো বল তো?

পারভেজ জানালো, এটা আমাদের জাতীয় রীতি। আমরা নিজের দেশের নিরাপত্তার জন্যে ইংরেজদের রাখি আর ষ্টুডিওর নিরাপত্তার জন্যে রাখি আফগানীদের।

—তোমরা নিজেদের ষ্টুডিও নিজেরা হেফাজত করতে পারো না?

তিক্তকণ্ঠে পারভেজ বললো, যদি তা পারতাম তাহলে সমুদ্রের ওপার থেকে কি তোমাদের এখানে আমন্ত্রণ জানাতাম?

মোবি মার্জনা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললো, আমি আমেরিকান সৈনিক, আমার নাম মোবি। আমি তোমাদের ষ্টুডিও দেখতে চাই।

পারভেজ গর্বভরে বললো, তোমার মন-মেজাজ ভালো তো? আমার নাম হচ্ছে পারভেজ। আজ তো ছুটি। ষ্টুডিওর মালিক এখানে নেই। তাছাড়া আজ ক্রিসমাস। সে যাই হোক, তুমি ষ্টুডিও কেন দেখতে চাচ্ছো? আজ তো কোন নৃত্যশালায় কোন নাজুক কোমর অথবা……

মোবি গম্ভীরভাবে বললো, আমি নাচ পছন্দ করি না।

পারভেজ অবাক দৃষ্টিতে মোবির প্রতি তাকিয়ে বললো, এসো তোমাকে আমার বন্ধুদের সাথে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

ষ্টুডিওর সামনের লনে কয়েকজন লোক বেতের চেয়ারে বসে ব্রিজ খেলছিল। পারভেজ তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, এরা হচ্ছে—মমতাজ, বোন ওজরা, হামিদ, প্রকাশ, শাম। আমরা ষ্টুডিওর গাড়ীর অপেক্ষা করছি। ছবি দেখতে যাব।

—কোন ছবি? মোবি জিজ্ঞেস করলো।

পারভেজ বললো, যে-কোন ছবি হলেই চলবে। তবে ভারতীয় ছবি দেখবো। তুমিও যাবে, তাই না?

মোবি কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর নীরবতা ভঙ্গ করে বললো, হ্যাঁ, যাবো। আমি আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় ছবি দেখিনি। এ কারণে একটি ছবি দেখার ইচ্ছে আছে।

পারভেজ বললো, চলো তাহলে।

গাড়ী এলে তাতে আরোহণ করে আমরা সিনেমা দেখতে রওয়ানা হলাম। হলে গিয়ে টিকেট নিয়ে ভেতরে আসন গ্রহণ করলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে মুংফল, সিদ্ধ আলু, ডাল, চিড়া, কাবাব ও পান খাওয়া হলো। প্রতিটি জিনিস এলেই মোবি পয়সা দেয়ার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে পয়সা বের করছিল, কিন্তু ওরা তাকে একবারও পয়সা দিতে দেয়নি। বলছিল, অতো আশঙ্কিত হচ্ছো কেন? আমরা জানি, মার্কিন সৈনিকরা খুব স্বচ্ছল। কোন একদিন তোমাকে পাকড়াও করা যাবে, কিন্তু আজ নয়। আজ তো ক্রিসমাস।

ছবি শেষ হলো। কেমন লাগলো—সবাই মোবির কাছে জানতে চাইলো। সৌজন্যের খাতিরে সে ছবির প্রশংসা করলো। বললো, বেশ ভালো, কিন্তু গানের সংখ্যা খুব বেশী। সম্ভবতঃ এটি মিউজিক্যাল ছবি, তাই না?

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে শাম গর্জন করার মতো কণ্ঠস্বরে বললো, এখানে সব ছবিই মিউজিক্যাল হয়ে থাকে মিশটার। বুঝলে মিশটার মোবি?

—'মিষ্টার' না হয়ে 'মিশটার' কেন? মোবি জিজ্ঞেস করলো।

শাম বললো, যার সাথে আমার ভালবাসা হয়ে যায়, তাকে আমি এভাবেই বলে থাকি। বুঝলে ভূতনী?

—ভূতনী কি? এর অর্থ কি? মোবি বিস্ময় বিস্ফারিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

—অর্থ-টর্থ কিছু জানি না। বাস, এসব হচ্ছে ভালবাসা মাখানো কথা, বুঝলে মোবি দুচি, চুচি, মুচি? শাম মোবির সোনালী চুলে আঙ্গুল দিয়ে আদর করলো।

মোবি খুশী হয়ে বললো, আচ্ছা, আমি তোমাকে এখন থেকে শামের বদলে শায়মী বলবো।

—শেম! শেম! হামিদ কলরব করে উঠলো।

—ফাটেমু! শাম হামিদের উদ্দেশ্যে বললো।

—ফাটেমু কি? মোবির সরল প্রশ্ন।

হামিদ বললো, এটাও একটা গালি। ও শালা গালি ছাড়া আর কিছু জানে না।

—হাঁ হাঁ, ঐ পুবিয়া ঠিকই বলেছে। শাম মোবির উরুতে চাপড় মেরে বললো, যদি বলো তবে তোমাকে কোন চীনা রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে গিয়ে ক্রিসমাস উৎসব পালনের ব্যবস্থা করে দিই? তাড়াতাড়ি বলো।

—ফাটেমু! মোবি শূন্যে তার মাথার টুপি আন্দোলিত করে বললো, বাস, আজ থেকে আমি আমার কর্ণেলকে বলবো, ও বয়! ও বয়!

ফাঙ্ ফাঙ্ রেস্টুরেণ্টে চওড়া বিদ্যুৎ বাতির নীচে খাবার টেবিল। সামনের দেয়ালে চিয়াং কাইশেক, চার্চিল এবং রুজভেল্টের ছবি টাঙ্গানো।

চিয়াং-এর চোখ দু'টো ভেতরের দিকে দেবে আছে, কিন্তু চেহারা ভাবলেশহীন। রুজভেল্ট একটি নবজাত রাষ্ট্রের শাসকের মতো পরিতৃপ্ত ও নিরুদ্বিগ্ন। চার্চিলের ঠোঁট দাঁতে চাপা—সিগারেট দৃঢ়ভাবে দাঁতে চেপে রেখেছেন। তাঁর অধরের কাঠিন্য এবং চোখের ইচ্ছা যেন বলছে, আমি মালিক আছি এবং মালিক থাকবো। প্রকাশ হঠাৎ লক্ষ্য করলো—চার্চিল এবং মরহুম ক্লামিনশের চেহারা একই রকম। উভয়ের চেহারায় আশ্চর্য রকমের মিল রয়েছে। চেহারার আকৃতি তথা গঠন বিন্যাস ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উভয় চেহারার আদল ছিল একই রকম। সেই বিমূর্ত প্রেরণা, চিতা বাঘের মতো সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। ফরাসী জাতি ক্লামিনশকে 'ফরাসী চিতা' নামে অভিহিত করতো।

প্রকাশ বারবার ছবিগুলোর প্রতি তাকিয়ে থেমে যাচ্ছিলো। হঠাৎ তার মনে হলো দেয়ালে সে অন্য কারো ছবি দেখতে চায়। কিন্তু কার ছবি? আজ ক্রিসমাস। মিত্রবাহিনীর পতাকা দেয়ালের উপরে সগৌরবে শোভা পাচ্ছে। প্রকাশের দৃষ্টি অন্য একটি পতাকা দেখতে চাচ্ছিলো। কিন্তু কোন্ পতাকা? সেই ছবি যা এখনো তোলা হয়নি, সেই পতাকা, যা এখনো নিরুদ্দিষ্ট।

প্রকাশ ভাবলো—তার মনের উদাসীনতা কেন বেড়ে যাচ্ছে? কেন সে চীনা ওয়েটারদের এবং সুদর্শন মার্কিনী ও কানাডীয় বৈমানিকদের চেহারায় অহংকার এবং আদেশের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে? সসম্ভ্রমে অর্ডার গ্রহণের জন্য দাঁড়ালেও প্রকাশ তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গির মধ্যেও গর্বের ছাপ লক্ষ্য করলো। এটা কি তার দৃষ্টিবিভ্রম? নাকি মানসিক স্থবিরতা?

শামও চুপচাপ বসে রইলো। সবাই একই রকম নীরবে বসে আছে।

—অজ্ঞাত কেন? মোবি নীরবতা ভঙ্গ করে বললো, এ রেস্টুরেণ্টের তৈরী 'প্রাণ' আমার খুব পছন্দ, আর তোমার শায়মী?

শাম চমকে উঠে বললো, হ্যাঁ, খুবই। শান্তকণ্ঠে এ কথা বলে একটা 'প্রাণ' তুলে শাম মুখে দিল। তারপর চারদিকে একনজর তাকালো, কিন্তু তাদের টেবিল ছাড়া অন্য কোন টেবিলে ভারতীয় ছিল না। এখানে আমাদের স্বদেশী লোক খুব কম।

সে ভাবলো। আবার ভাবলো—ভারতীয়রা এখানে কোথায়? ওরা তো বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ এবং বিহারে ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে। মূর্খ! তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে এলো।

প্রকাশ কথা বলার চেষ্টা করে বললো, মার্কিনী চপের যে রকম স্বাদ, চীনা চপে ও রকম স্বাদ পাওয়া যায় না।

হামিদ বললো, হ্যাঁ, তাই। আর চীনা চপে খাদ্যপ্রাণও খুব কম।

মমতাজ বললো, মার্কিনী চপ আমাদেরও খুব পছন্দ।

—ধন্যবাদ! মোবি খুশী হয়ে বললো, আমি এটাকে ক্রিসমাসের উৎকৃষ্ট টোষ্ট মনে করবো।

দু'জন কানাডীয় বৈমানিক পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় থমকে দাঁড়ালো।

মোবি তাদের প্রতি তাকিয়ে ঝটপট উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ও জন, আর এ হচ্ছে টম। উভয়ে মন্ট্রিল থেকে এসেছে।

মোবি তার ভারতীয় বন্ধুদের সাথে বৈমানিক দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দিল। প্রাথমিক পরিচয়ের পর জন এবং টম তাদের টেবিলের পাশেই চেয়ার টেনে বসলো।

টম বললো, কিন্তু আমরা কিছু খাব না! এক্ষুণি আমরা—।

কিছুক্ষণ চারদিকে থমথমে নীরবতা বিরাজ করলো, তারপর রেকর্ডে চীনা গান বাজতে লাগলো।

মোবি বললো, জন, এই ক্রিসমাসে আমরা দেশ থেকে কতো দূরে আছি!

জন চুপ করে রইলো।

টম বললো, প্রকৃতির কোলে বরফ দেখতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু বাইরে

তাকালে আকাশে ফিকে ফিকে নক্ষত্র দেখা যায়।

জন বললো, বেয়ারা, এক গ্লাস পানি আনো।

মোবি বললো, তোমার ছোট ছোট ভাই-বোন তোমার মা-বাবার মন ভুলানোর জন্যে বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর আমার মায়ের আমি ছাড়া আর কে থাকবে? আগে থেকেই জন আমাদের দু'জনের খুব কাছাকাছি ছিল। কখনো কখনো মায়ের স্মৃতি আমাকে কাপুরুষ করে তোলে।

টম বললো, এখন আমাদের বাসায় মোমবাতি জ্বলছে। ক্রিসমাসের এ দিনে বাইরের গলিতে একর্ডিয়ানের সঙ্গীত বাজছে। হায়! একবার শুধু সেই সঙ্গীত শুনতে ইচ্ছে করছে।

মোবি বললো, আমি ওসব বন্ধুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা আজকের এ দিনে···

মোবি আর কোন কথা না বলে চুপ মেরে গেল।

জন বিষয় পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করলো, পারভেজ সাহেব, আপনি কতো বেতন পান?

জবাব শুনে জন বললো, মাত্র এই? আমাদের ওখানে এ ধরনের বেতন তো একজন সাধারণ লোকও পেয়ে থাকে। মাত্র আটশ' টাকা!

হামিদ বললো, এখানে এ বেতনও খুব বেশী। ভারতে মাথাপিছু দৈনিক উপার্জন দু' পয়সা।

—হ্যাঁ, এদেশ খুবই গরীব। মন্ট্রিলের বৈমানিক বেপরোয়া ভঙ্গিতে বললো। তারপর বললো, মোবি ক্যাম্পে ফিরে যাবে?

মোবি বললো, এক্ষুণি নয়। তুমি যাও, আমি আরো কিছুক্ষণ পরে যাব।

উভয় কানাডীয় বৈমানিক শুভরাত্রি বলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল।

তাদের যাওয়ার পর মোবি বিল পরিশোধের জন্যে বেশ পীড়াপীড়ি করলো। শেষ পর্যন্ত শামের বকুনি খেয়ে সে নিবৃত্ত হলো। বিল

পরিশোধ করে রেষ্টুরেন্টের বাইরে বেরুলে পারভেজ, প্রকাশ, হামিদ, ওজরা এবং মমতাজও বিদায় চাইলো।

শাম এবং মোবি একাকী রয়ে গেল। তারা উভয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। সে রাস্তায় একটা ইংরেজী ছবিঘর রয়েছে। বাতাসে মদের গন্ধ, পোষাকে আতরের গন্ধ, ঠোঁটে পশ্চিমা সঙ্গীত।

'নওশেরওঁয়া এণ্ড নওশেরওঁয়া এণ্ড সন্স' মদ বিক্রেতার দোকানের বিস্তৃত এলাকায় একটি লাউড স্পীকার লাগানো হয়েছে।

একজন সৈনিক তার সঙ্গীদের যীশুর উপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রশিক্ষণ দিয়ে বলছিল, আমরা পাপী। আমরা সবাই পাপী। এসো যীশুর চরণে নত হও। এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com সাইট থেকে ডাউনলোডকৃত।

শ্রোতাদের মধ্যে আমেরিকান, কানাডিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান এবং ইংরেজ সৈনিকও ছিল। তারা চৌরাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়াচ্ছিল, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর চলে যাচ্ছিলো।

তিনজন ভারতীয় বেয়ারা গভীর মনোযোগের সাথে এ বক্তৃতা শুনছিল। তারপর মাদ্রাজী ভাষায় তার উপর সমালোচনা করছিল। একজন ভিক্ষুক, একজন কুষ্ঠ রোগী, দু'টি কুকুর শিকলে বাঁধা অবস্থায় হাতে ধরে একজন ভৃত্য—এরাও মনোযোগের সাথে বক্তৃতা শুনছিল।

—যীশুর চরণে নত হও, আমরা সবাই যীশুর মেষ।

—মেষ নাকি ব্যাঙ্ক? শাম জিজ্ঞেস করলো।

মোবি বললো, তুমি সম্ভবতঃ যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করছো। যুদ্ধের অপকারিতা তথা ক্ষতিকর প্রভাব আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি মনে করি যে, মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির আদর্শের জন্যে রক্তপাত করা বৈধ।

শাম জিজ্ঞেস করলো, কার আদর্শ? এক আদর্শ রয়েছে ধনীর, এক আদর্শ রয়েছে দরিদ্রের। এক আদর্শ রয়েছে শ্বেতাঙ্গের, এক আদর্শ রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গের। এই উভয় শ্রেণীই মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির কথা চিন্তা করে। তবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতর, স্বপ্ন ভিন্নতর। আমার তো মনে হয় যে এটা যুদ্ধ নয়, বরং এটা হচ্ছে দু'টি হৃদয়ের সংঘাত।

—তুমি সত্যি কথাই বলেছো। মোবি বললো, কিন্তু এটা কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের স্বপ্নের সংঘাত নয়। আমরা তাদের স্বপ্নের বিরুদ্ধে লড়ছি—যে স্বপ্ন ফ্যাসিবাদের ইজারাদাররা দেখছে। টোগো যে স্বপ্ন দেখে, হিটলার যে স্বপ্ন দেখে, তার একটা কালো একটা সাদা—তোমার এ ধারণা ভুল।

শাম বললো, আমি জানি. এ স্বপ্ন বড় ভয়ানক। আমি তাদের ঘৃণা করি। কিন্তু তুমিও যে সেই একই স্বপ্ন দেখছো না, তার কি প্রমাণ আছে?

মোবি গর্বভরে বললো, তার প্রমাণ হচ্ছে আমাদের আমেরিকার ইতিহাস। ইংরেজরা গণতন্ত্র-প্রিয় জাতি। রাশিয়ানরা পছন্দ করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। চীনে রয়েছে কমিউন ব্যবস্থা—সান ইয়াৎ সেনের মতো স্বাধীনতা-প্রিয় লোকেরাই সে ব্যবস্থা বিন্যাস করেছেন। আমাদের বিবেক সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

শাম রুষ্টকণ্ঠে বললো, আর ভারত? সম্ভবতঃ যুদ্ধের যৌক্তিকতার প্রেক্ষিতে তোমার বিবেকও লোহা এবং কংক্রিটে পরিণত হয়েছে, নৈতিকতার বোমা তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

মোবি বললো, এদেশে আমি তোমাদের অতিথি—তোমাদের সরকারের অতিথি। এদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা নেই। তা ছাড়া আমি এখানের জটিল রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যেতে চাই না। এ রাজনীতির জটিল গ্রন্থি মোচনও আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু কিছুদিন আগে বঙ্গদেশে হাজার হাজার মানুষকে দুর্ভিক্ষে মারা যেতে দেখে আমি ভেবে ভেবে হয়রাণ হয়ে গিয়েছিলাম যে, এরা কেমন লোক, চোখের সামনে প্রতিবেশীদের, আত্মীয়-স্বজনদের মরতে দেখেও তাদের কোন সাহায্য করছে না। এক দানা চাল নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে না, ওদের দুঃখে এক ফোঁটা অশ্রু বর্ষণ করছে না। সত্যি বলছি, আমি এ ধরনের পাষাণপ্রাণ মানুষ কোথাও দেখিনি। এটা জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা-শূন্যতা নয় তো? শোন শায়মী, আমার মনে হয় এটি একটি দেশ নয় কয়েকটি দেশ, একটি জাতি নয় কয়েকটি জাতি, একটি ভাষা নয় কয়েকটি ভাষা, একটি কালচার নয় কয়েকটি কালচার এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে পৃথক, নিজ নিজ স্থানে তারা

অবস্থান করছে, কারো সাথে কারো কোন সম্পর্ক নেই।

শাম জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি মনে হয়, বাংলাকে সাহায্য করছে কে? এই কয়েক লাখ টাকা, খাদ্যশস্যের কিছু পেটি যা কিনা সরকারী বা বেসরকারীভাবে কিছু পাবলিকের ইঙ্গিতে সরকারের নামে বিতরণ করা হয়েছে, এগুলো কি বাংলার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে যথেষ্ট ছিল? এ সাহায্য তো আটায় লবণ মেশানোর শামিল। বাংলাকে স্বয়ং বাংলাই বাঁচিয়েছে, যদি তা না হতো তা'হলে আজ তুমি একজন বাংগালীকেও জীবিত দেখতে পেতে না। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ এতো ভয়াবহ ছিল যে আর কি বলবো। কিন্তু যতো কিছু হোক, সাহায্যেরও একটা সীমা থাকে। যারা নিজেরাই মৃত্যুর জালে জড়িয়ে আছে, তারা অন্যদের কিভাবে সাহায্য করবে? তোমাদের সংসারে সাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতা রয়েছে, জনসংখ্যার আধিক্য রয়েছে। তোমরা প্রতিবেশীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে করুণা বিলাতে পারো, তাদের বিপদ দেখে অশ্রু বর্ষণ করতে পারো, কিন্তু যে সব দরিদ্রের নিজেদের খাদ্য নেই তারা প্রতিবেশীদের কিভাবে সাহায্য করবে? আর অশ্রু? এ মঞ্জিলে পৌঁছে অশ্রুও জবাব দিয়ে বসে। অশ্রুও তো রুটি থেকেই তৈরি হয়। সেই রুটি খেতে না পেলে মানুষ অন্যের ক্ষুধা দেখে কিভাবে অশ্রু বর্ষণ করবে? আমরা এক জাতি নই অনেক জাতি এটা ঠিক, কিন্তু ইউরোপেও তো অনেক জাতি রয়েছে। এন. আর. আর. এ. তাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত নয় কেন? বলকানের জাতিসমূহ বিশেষতঃ গ্রীক জাতি দুর্ভিক্ষের কি ধরনের পর্যায় অতিক্রম করছে? সেখানে মিত্রশক্তি কতো কষ্ট করে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছিয়েছে। আমরা এখানে চাই খাদ্যদ্রব্য, পাই হুইস্কির বোতল।

মোবি হেসে বললো, ব্যস, আমি এ সবকিছু কানে শুনেছি।

—তার মানে?

—সব শুনছি, বুঝছি, কিন্তু কিছু বলবো না।

—কেন?

—আমাদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে যে, সবকিছু শুনবে, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারবে না, বিশেষতঃ এ সমস্যার ব্যাপারে। শোনো আরো একটা মজার বিষয় মনে পড়েছে। আমাকে বলা হয়েছে যে, ভারতীয়দের কাছ থেকে কোন উপহার উপঢৌকন গ্রহণ করবে না। যদি একান্তই করতে হয় তবে নিতান্ত স্বল্পমূল্যের উপহার গ্রহণ করবে।

—কেন?

—শুনেছি, ভারতীয়রা সাধারণ একটা উপহার দিয়ে বিরাট পুরস্কার লাভের প্রত্যাশায় থাকে। এটাই এ দেশের নিয়ম।

নিজের তিক্ততা গোপন করে শাম ধীরে ধীরে বললো, তুমি সত্য কথাই বলেছো। কিন্তু আজ থেকে দেড়শ' বছর আগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্মচারীদের এ পরামর্শ দিলে ভালো হতো। আমরা তো উপঢৌকন দিতে গিয়ে নিজেদের বাড়ী-ঘর পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়ে বসে আছি। এর দ্বারা যেটুকু লাভবান আমরা হয়েছি, সেটা দুনিয়ার সবাই জানে। ইতিহাসে সাক্ষ্য রয়েছে যে, ভারতবর্ষের লোকেরা কখনো কাউকে লুণ্ঠন করেনি, কিন্তু সে সব সময় লুণ্ঠিত হয়েছে। ইতিহাস এটাও সাক্ষ্য দেবে যে, অতীতে সব সময় লুণ্ঠনকারীরা এদেশে এসেছে। ভারতীয়রা কখনো বাইরে গিয়ে কোন দেশ বা জাতিকে লুণ্ঠন করেনি। আজ আমাদেরকে এ অপবাদ দিচ্ছে সেই সভ্যতার উত্তরাধিকারীরা, যারা রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে তাদের সমগ্র দেশ কেড়ে নিয়েছে। ভগবানই জানেন, সে সময় এ পরামর্শ কেন দেয়া হয়নি।

মোবি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। মরিয়া হয়ে বললো, তুমি কি বলতে চাও, পরিষ্কার করে বলো।

—আমি সেসব কথা বলতে চাই যা কিছু তোমরা পরাধীন ইউরোপের জন্যে বিবেচনা করে থাকো। অর্থাৎ স্বাধীনতা এবং অন্ন। আমাদের শুধু স্বাধীনতা প্রয়োজন। অন্ন আমরা নিজেরা উৎপাদন করবো।

—স্বাধীনতা দেয়া হয় না, অর্জন করতে হয়।

—তা'হলে পরাধীন ইউরোপকে তার ভাগ্যের হাতে কেন ছেড়ে দিচ্ছ না? তার নিজের দুঃখ তাকেই দূর করতে দাও।

—এটা তোমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। আমরা তাতে কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারি?

—ইউরোপীয় জাতিসমূহের সাথে যদি একই রকম আচরণ করো তা'হলে তোমাদের চালবাজি নীতি সুদৃঢ় হবে, কিন্তু চারিত্রিক দিক থেকে ব্যর্থতা প্রমাণিত তথা সুপ্রকট হয়ে উঠবে। কারণ মানব সমাজের দেহ একটি। যদি পা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তা'হলে মস্তিষ্ক সাহায্য করতে নারাজ হতে পারে না। সম্ভবতঃ এ বাস্তবতা তোমরা এখনো বুঝতে পারছো না। আট-দশটি যুদ্ধের পর বুঝতে পারবে যে, শান্তি এবং যুদ্ধের মতোই মানুষের স্বাধীনতাও অবিভক্ত অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ বর্ণনযোগ্য নয়। এই স্বাধীনতা সমগ্র মানব জাতিরই উত্তরাধিকার—এই মৌলনীতি সমগ্র মানব সমাজের জন্যে বিবেচিত না হলে আমরা পরাধীন থাকবো তা ঠিক, কিন্তু তোমরাও প্রতি সিকি শতকের পর নিজেদের নববধূদের বিধবা আর সন্তানদের এতিম করতে থাকবে। তোমাদের রাজনীতিবিদরা সম্ভবতঃ এটাকে বিজ্ঞতা হিসেবে ব্যাখ্যা করবে, কিন্তু আমি এটাকে আত্মহনন ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারবো না।

মোবি হেসে বললো, টম সত্যিই বলেছিল যে, কোন শিক্ষিত ভারতীয়ের সাথে কথা বলো না। ঘুরে-ফিরে তারা আলাপে রাজনীতি টেনে আনবেই।

শাম হঠাৎ নরম হয়ে গেল। লাজনম্র ভঙ্গিতে মোবিকে বললো, আচ্ছা তা'হলে বল, আর কি বিষয়ে আলাপ করা যায়?

—ফ্যাটেমু! মোবি চিৎকার করে বললো। উভয় বন্ধু হাসতে লাগলো। বিতর্কে সৃষ্ট তিক্ততা কেটে গেল।

শাম মোবির উরুতে হাত রেখে বললো, এসো, আমরা নিজেদের প্রেমিকাদের পরিচয় বর্ণনা করি। প্রথমে নিজের প্রেমিকার বিষয়ে বলছি, তারপর তোমাকে সুযোগ দেব। শোনো, ওর নাম হচ্ছে রামু। এ কথা বলতে গিয়ে শামের দু'চোখ স্বপ্নিল হয়ে উঠলো—প্রেমিকার পুরো নাম উচ্চারণের আগেই সে নাম চারদিকের বাতাসে দুধ-চিনির মতো যেন

মিলেমিশে গেল।

প্রেমিকার নাম উচ্চারণের সাথে সাথে তার ভঙ্গি এমন মোহনীয় হয়ে উঠলো যে, মোবি অস্পষ্ট আলোর মৃদু নিঃশ্বাসের ছোঁয়ার মতো সে নামের ছোঁয়া নিজের মুখমণ্ডলে অনুভব করলো। সাথে সাথে লক্ষ্য করলো রাত গভীর হয়ে গেছে, আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী উজ্জ্বল ঝলমলে হয়ে উঠেছে, বাতাসে সুবাস ছড়িয়ে পড়েছে, যুথ দূরে অনেক দূরে কোনো এক গভীর গুহায় গিয়ে লুকিয়েছে।

মোবি ক্লান্ত-শ্রান্ত শান্তি-সন্ধানী মানুষের মতো নিজের বাহু শামের কাঁধের উপর তুলে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বললো, আর একবার আর একবার বলো শামমী, তা'হলে তোমার অধর তোমার দিলদারের নাম পুনরায় চুম্বন করতে পারবে। ও বয়! ও বয়!

শাম হাসিমুখে জোরে মোবির হাত চেপে ধরলো। তারপর উভয়ে রাস্তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলো। তাদের দেখে মনে হলো নক্ষত্রের ম্লান অনুজ্জ্বল আলোর আলো-আঁধারীর ঝিলিমিলিতে, কুয়াশার পৃথিবীতে ওরা দু'জনই শেষ মানুষ।

ভিটল ওয়াডিতে আয়োজিত বনভোজনে হামিদ এবং ওজরা মোবিকেও নিমন্ত্রণ জানালো। বেশ কিছুদিন পর মোবি তাদের সাক্ষাৎ পেয়েছে।

মোবির চেহারা আগের চেয়ে আরো উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হয়ে গেছে। ঘাড়ে এবং চেহারায় আঁচড়ের দাগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

—বিড়াল পুষছো নাকি হে? হামিদ অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে মোবিকে জিজ্ঞেস করলো।

মোবি অপ্রস্তুত হাসি হেসে বললো. নিউইয়র্কে একটা বিড়াল রয়েছে, সেটা পোষার হচ্ছে আমার আছে। এগুলো হচ্ছে জুজুৎসুর চিহ্ন।

—ইদানীং জুজুৎসু শিখছো নাকি? পারভেজ মোবির কাছে জানতে চাইলো।

মোবি বললো, অন্যদের শেখাচ্ছি, অনেকদিন আগেই জাপানে আমি শিখেছিলাম।

—জুজুৎসু এবং বক্সিং-এর মধ্যে তুমি কোন্‌টাকে ভালো মনে করো?" পারভেজ জানতে চাইলো।

মোবি আঙুল গুণে গুণে বললো, বক্সিং-এ প্রস্তুতি প্রয়োজন, জুজুৎসুতে চালাকি প্রয়োজন। বক্সিং-এ সততা প্রয়োজন, জুজুৎসুতে সাধনা প্রয়োজন। বক্সিং-এ সোজাসুজি মোকাবিলা করা হয়, জুজুৎসুতে সুযোগ সন্ধান এবং বিচক্ষণতার সাহায্যে এগুতে হয়।

—এ দু'টি খেলা দু'টি ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরে। প্রকাশ বললো।

পারভেজ জিজ্ঞেস করলো, তুমি এ দু'টির মধ্যে কোনটিকে উত্তম মনে করো?

ওজরা বললো, তুমি মোবিকে জিজ্ঞেস করছো—সে আমেরিকা এবং জাপানের মধ্যে কাকে পছন্দ করে, তাই না?

সবাই খিলখিল করে হেসে উঠলো।

হামিদ বললো, আমি যতোটা বুঝি এই জুজুৎসু হচ্ছে একটা কূট-কৌশলের খেলা। প্রতিযোগী এই কূট-কৌশলের সাহায্যেই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে ফেলে। প্রকৃত পক্ষে এ পৃথিবীতে কূট-কৌশলটাই হচ্ছে বড় কথা।

প্রকাশ বললো, জাপানীরা তো সে রকম চেষ্টাই করছে। কিন্তু তারা জানে না যে, শুধু কূট-কৌশলেই সব কাজ হয় না। শক্তিও থাকতে হয়।

মোবি বললো, শক্তি আসে বক্সিং থেকে। তারপর আলাপের বিষয় পরিবর্তন করে সে বললো, বোন ওজরা, আপনি সেদিন 'ওয়াদিয়া হলে' বাংলার ক্ষুধার্ত উলঙ্গ মানুষের সাহায্যার্থে যে নাটক করেছিলেন, সেটি আমার খুব ভালো লেগেছে।

—তুমি কোথায় বসেছিলে? মমতাজ অভিযোগের সুরে তাকে জিজ্ঞেস করলো।

মোবি বললো, চতুর্থ সারিতে। সেদিন আমার সাথে আমার কর্ণেল ছিলেন।

—ফ্যাটেমু! শাম চিৎকার করে বললো।

—ফ্যাটেমু! মোবি হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, জানো শায়মী, আমার কর্ণেল আমার মুখে ফ্যাটেমু শুনে ভীষণ খুশী হন। এ কারণেই তিনি আমাকে জুজুৎসু গ্রুপের অফিসার নিযুক্ত করেছেন। জানো, সেদিন তোমার অভিনয় দেখে তিনি আমাকে কি বলেছেন? বলেছেন—ও বয়, ও বয়, আমি জানতাম না যে, ভারতীয় নাটক এতোটা জীবনবাদী এতোটা বাস্তবভিত্তিক হয়ে থাকে। এখন থেকে আমি ভারতীয় ছবি দেখবো। সেই জোশের কারণেই গতকাল আমরা 'শকুন্তলা' দেখতে গিয়েছিলাম। সে যাক, ওজরা বোন, নাচ ছিল সেদিনের নাটকের প্রাণ।

শাম মোবির প্রতি চোখ বড় করে তাকিয়ে বললো, আমার কথা কিছুই তুমি বললে না? জানো, আমি ছিলাম সে নাটকের প্রযোজক।

—ফ্যাটেমু! মোবি শামকে রাগানোর জন্যে বললো। শাম মোবিকে ধরার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ালে মোবি ছুটে পালালো। শাম দ্রুত ছুটে গিয়ে কচি সবুজ ঘাসের উপর মোবিকে পাকড়াও করে এক চোট কুস্তি লড়লো, জড়াজড়ি করলো। মোবি জুজুৎসুর দ্বারা আঘাত করলো আর শাম বক্সিং দিয়ে মোবিকে প্রত্যাঘাত করলো। অল্পক্ষণের মধ্যে শাম মোবিকে নীচে ফেলে দিল। তারপর উভয়েই হাসতে হাসতে প্যান্ট শার্ট ঝেড়ে-মুছে উঠে এলো।

প্রকাশ মোবিকে বললো, শোনো মোবি, তোমাদের এ জুজুৎসু কোন কাজের নয়।

শাম বললো, পাহলোয়ানী শিক্ষা করো প্রিয়তমেষু। কর্ণেলকে বলো তার সৈনিকদের তিনি যেন পাহলোয়ানী শিক্ষা দেন। আমাকে সাথে নিয়ে চলো। ভারতীয় পাহলোয়ানী তথা কুস্তির কাছে বক্সিং-ও চলে না, জুজুৎসুও চলে না।

—কিন্তু এ কুস্তি তো তোমাদের দেশের কোন কাজে আসে না। মোবি লক্ষ্য করলো যে, তার এ মোক্ষম উক্তিতে ভারতীয় বন্ধুরা কাবু হয়ে গেছে। তাদের চেহারায় ফ্যাকাশে ভাব ফুটে উঠেছে। উচ্ছল উৎফুল্ল শাম মাথা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

মোবি সরলভাবে বললো, আমি খুবই দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। আমি কিছুতেই এটা চাইনি যে……

মোবিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে ওজরা বোন শান্ত গম্ভীর স্বরে বললো, বসো, এবার চা পান করো। তারপর নদীতীরে গিয়ে বসবো। সেখানে পারভেজের গান শুনবো।

চা পান করতে করতে মোবি ভিটল ওয়াড়ির পরিবেশ প্রকৃতিকে নিজের অনুভূতির সাথে একাত্ম এবং বিলীন করে তোলার জন্যে অতীতের অপ্রিয় স্মৃতিগুলো বিদায় করতে সচেষ্ট হলো। অল্পক্ষণের মধ্যে ভিটল ওয়াড়ির অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মোবিকে ভাবপ্রবণ করে তুললো। এ সৌন্দর্য বিষ নয়, মদ নয় বরং তা হচ্ছে নির্জলা সারল্যে পরিপূর্ণ শক্তি-দায়িনী প্রেরণা।

একটি আম গাছের তলায় বাহুর উপর মাথা রেখে মোবি শুয়ে পড়লো। নদীর স্বচ্ছ নিটোল পানিতে ভেসে যাওয়া ফুল সুন্দর প্রদীপের মতো ঝলমল করছিল। শ্যামল বৃক্ষের সারিবদ্ধ শ্রেণী দু'চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছিলো। পানির ছন্দোময় প্রবাহ সুরেলা সঙ্গীতের মতো বয়ে যাচ্ছিলো। এ মোহন দৃশ্য দেখে মোমের আলোয় হাসিমুখে নৃত্যরতা বোন ওজরার নাট্যাভিনয়-কালীন দৃশ্য মোবির চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ম্যাডোনার হাসি আর ক্রিসমাসের মোমবাতির আলো– ঈশ্বরই জানেন ভারতীয় রমণীদের চেহারা দেখে কেন যে তার ম্যাডোনার চেহারা মনে পড়ে যায়। উভয়ের মধ্যে কি অপূর্ব মিল। কেন এ ভূ-খণ্ড তার চেনাপরিচিত মনে হয়? কেন এদেশের লোকদের তার ভাই-বন্ধু মনে হয়? এই গাছপালা, এই মাটি, এই নদী, সবুজ-শ্যামল দৃশ্যাবলী, পশ্চিম প্রান্তের প্রবেশ পথে নীল নীল মনোরম প্রকৃতি। সে নীলাভ প্রকৃতি দেখে মনে হয় কুমারী মেয়েরা মাথায় কলসী নিয়ে নীচে নদীতে অবতরণ করছে। এটা কি জেরুজালেম নাকি ভিটল ওয়াড়ি? মন্দিরের সোনালী রং এবং ত্রিশূল মোবির চোখের সামনে চিকচিক করতে লাগলো। ত্রিশূল সে তো ক্রুশই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই। এই যে নদীতীরের মন্দির, এই নদীর পানিতে মেশানো আবির, নদীতীরে মাঠে হাল চাষে নিয়োজিত কৃষক। কেন সে এসব দৃশ্যের সাথে

এতো আত্মীয়তা অনুভব করছে? কেন এসব এতো পরিচিত মনে হচ্ছে? চেনা হওয়া সত্ত্বেও কেন অচেনা রয়ে গেছে? মানুষ এবং মৃত্তিকার ছবি তো নিতান্ত সাদামাটা। এর মধ্যে সবুজ মিশে রয়েছে, শীতল নিটোল পানি রয়েছে, লাঙ্গল রয়েছে, আবিরের সোনা রয়েছে, উপাসনার জন্যে মন্দির রয়েছে—এসব নিষ্কলুষ নির্দোষ চিত্রাবলীর মধ্যে কেন রক্তাক্ত দৃশ্যাবলী সংযোজিত হচ্ছে? কেন? কেন?

হঠাৎ পারভেজ বললো, মোবি, আমি যখন নদীতীরে এ মন্দির দেখতে পাই তখন তখনই আমার মন উপাসনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে।

—কার উপাসনা? মমতাজ রসিকতাচ্ছলে জিজ্ঞেস করলো।

মোবি চিৎকার করে বললো, ও শায়মী, ও শায়মী বয়, এদিকে এসো, প্রেম হচ্ছে।

শাম কিছুদূরে বন্যফুল তুলছিল। রুমালে জড়িয়ে সে বেশ কিছু ফুল নিয়ে এসে মমতাজ এবং পারভেজের মাথার উপর ঢেলে দিল। মোবি তাড়াতাড়ি মমতাজ এবং পারভেজের হাত নিজের হাতে নিয়ে পাদ্রীর অনুকরণে বিয়ের খোতবা পড়তে শুরু করলো। মমতাজ এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। সবাই উচ্ছল আনন্দে হাসতে লাগলো।

পিতলের কলসী মাথায় নিয়ে মারাঠী মেয়েরা মন্দিরের কাছে সুদৃশ্য একটা জলাশয়ে পানি নিতে এলো। তাদের শাড়ীর মধ্যেকার সুশোভিত ফুল চলার ছন্দে ময়ূরের পেখমের মতো নাচতে লাগলো।

প্রকাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, নারী বক্ষ হাসে তখন ফুলের দেহে শিশির চমকায়, ঝর্ণার পানি গান গাইতে শুরু করে।

হামিদ বললো, তুমি একটা পেঁচক, আস্ত হাবা। নারী তো কোথাও নেই, ওরা তো শুধু পুরুষের কল্পনা।

ওজরা বোন হামিদের প্রতি কটমট দৃষ্টিতে তাকালো।

পিতলের কলসী মাথায় নিয়ে মেয়েরা উঁচু খাঁড়ি বেয়ে উঠছিল। খাঁড়ি পেরোলেই তাদের গ্রাম। খাঁড়ির মেঠো-পথে মেহেদী গাছের

ঝাড়। সে জায়গার মাটি ব্যবহারে কুমারী মেয়েরা স্বামী সোহাগিনী হতে পারে বলে প্রবাদ রয়েছে। ভিটল ওয়াড়ির ঝর্ণার পানিতে অমৃতের স্বাদ, মাটিতে যেন চিনি মেশানো। কাজেই সেখানের খাদ্যশস্য আর ফলমূল সুমিষ্ট হবে না কেন, কুমারী মেয়েদের কণ্ঠে কেন মিষ্টি রসধারা সঞ্চিত থাকবে না! ভিটল ওয়াড়ির গান গাও, ভিটল ওয়াড়ি একটি সুবর্ণ গ্রাম।

প্রকাশ মোবিকে উপরোক্ত কথা সম্বলিত গান শোনালে মোবি আনন্দে নেচে উঠলো। বললো, শ্যামজী, যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আমি ঐ মেঠো-পথে চঞ্চল ছন্দে হেঁটে যাওয়া মেয়েদের ছবি তুলবো।

—কেন? শ্যামের জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে সন্দেহের সুস্পষ্ট ছাপ।

মোবি বললো, আমরা যান্ত্রিক সমাজে বাস করি। তুমি বুঝবে না এ দৃশ্য আমার জন্যে কতো মূল্যবান, কত বিস্ময়কর।

শ্যাম ছবি তোলার অনুমতি দিল। মোবি ক্যামেরা ঠিক করে ঢালুতে নেমে ঝোপের আড়ালে গিয়ে একটা গাছের পেছনে দাঁড়ালো।

সেখানে কিছুক্ষণ মোবি মুগ্ধদৃষ্টিতে মেয়েদের প্রতি তাকিয়ে রইলো। খাঁড়ির প্রান্ত থেকে মেয়েদের মধুর কণ্ঠের গান ভেসে আসছিল। হঠাৎ মোবি সাপ সাপ বলে চিৎকার করলো। সবাই সেদিকে ছুটে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তারাও সাপ সাপ বলে চিৎকার করে উঠলো।

মেঠো-পথ ধরে গৃহাভিমুখে যাওয়া মেয়েরা থমকে দাঁড়ালো। তাদের কণ্ঠের গান থেমে গেল। তাড়াতাড়ি তারা নীচে নেমে এলো।

মোবি তাকে দংশনকারী সাপটির মাথা পিষ্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু তার নিজের চেহারা ক্রমেই নীল হয়ে যাচ্ছিলো। মোবি আর্তকণ্ঠে বললো, সাপ আমাকে দংশন করেছে, দেখো।

পায়ের গোড়ালীর উপরের চামড়ার রং নীল হচ্ছিলো। শ্যাম ক্যামেরার ফিতা ছিঁড়ে হাঁটুর উপর শক্ত করে বেঁধে দিল। মমতাজ তার দোপাট্টা শ্যামের হাতে দিয়ে বললো, পেঁয়াজ খাওয়াও ওকে, পেঁয়াজ। এ কথা বলে সে আম গাছের নীচে রাখা চাল-ডাল তরি-তরকারীর মধ্যে পেঁয়াজ খুঁজতে লাগলো।

গ্রামের একটি মেয়ে বললো, এ তো বিষাক্ত সাপ। হায়!

হামিদ শঙ্কিত কণ্ঠে বললো, এখন যদি কোনখান থেকে মোটর গাড়ী পাওয়া যেত।

প্রকাশ বললো, মোটর তো আসবে সন্ধ্যা সাতটায়।

গ্রামের অন্য একটা মেয়ে বললো, এ তো বিষাক্ত সাপ। এ তো পাঁচ মিনিট।

মোবির অবস্থার ক্রমেই অবনতি হচ্ছিলো।

হাল্কা পাতলা শ্যামলা রঙের একটি মেয়ে সসঙ্কোচে এগিয়ে এসে মাথা থেকে কলসী নামিয়ে মাটিতে রাখলো। তারপর গভীর মনোযোগের সাথে দংশিত স্থানের ক্ষতচিহ্ন দেখলো।

মেয়েটি কি করছে সেটা কেউ বোঝার আগেই সে ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে বিষ চুষে থু থু করে ফেলে দিচ্ছিলো। একবার, দু'বার......। মোবি নিজের পা সরিয়ে নিতে চাইলো, কিন্তু মেয়েটি পা সরাতে দিল না।

তৃতীয়বার মুখ লাগাতেই মোবি জোরে পা টেনে নিল। এতে মেয়েটির সামনে রাখা কলসী গড়িয়ে নীচের দিকে যেতে লাগলো। পানির কাছে যাওয়ার সাথে সাথে মেয়েটি কলসী ধরে ফেললো। তারপর কুলি করে কিছু ঘাস চিবিয়ে ফেলে দিয়ে কলসী ভর্তি করে উপরের দিকে উঠতে লাগলো।

হঠাৎ মোবি বললো, কথা শোন।

মেয়েটি সসঙ্কোচে মোবির প্রতি তাকালো।

—তোমার নাম? মোবি জিজ্ঞেস করলো।

মেয়েটি লাজনম্র ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে নিল। অন্য একটি মেয়ে শান্ত স্বরে বললো, ওর নাম মোহিনী, কিন্তু ও তো বোবা। এ কথা বলেই মেয়েটি হেসে ফেললো। মোহিনীও মুখ নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

—আমি ওর বাবা-মার সাথে দেখা করতে চাই। মোবি বললো।

একটি মেয়ে জানালো, ওর মা-বাবা মরে গেছে। ও তার চাচার কাছে থাকে।

মোবি শামকে বললো, কিন্তু এ মেয়েটিকে আমার সাথে যেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

—চুপ করো ভূতনী। শাম বললো।

মেয়েরা দ্রুতপায়ে তাদের গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলো। মোবি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

হাসপাতালে মোবিকে ডাক্তার বললো, মেয়েটি আপনার দংশিত স্থানে মুখ দিয়ে বিষ নিয়ে ভালোই করেছে, তা না হলে আপনাকে বাঁচানো যেত না।

—কিন্তু আমি তো সাপে কাটলে বিষের প্রতিক্রিয়া হবে না, এ রকম ইঞ্জেকশন ইণ্ডিয়ায় আসার পরই নিয়েছিলাম। মোবি ডাক্তারকে জানালো।

ছোট আকারের সাপের চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথার প্রতি তাকিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে করতে ডাক্তার বললেন, কিন্তু আপনার সেই ইঞ্জেকশনে এ সাপের বিষ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল না। এবার যেতে পারেন। এখন আর আপনার কোন রকম ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

মোবি বিড় বিড় করে একটি নাম উচ্চারণ করলো, মোহিনী!

—চুপ করো ভূতনী! শাম ধমকের সুরে মোবিকে বললো।

মোবি এরপর শামের বাসায় দেখা করতে এলো। ইতিমধ্যে জাপানী সৈন্যরা আসামে হামলা করেছে। মোবিকে আসামে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরদিন সকালেই তাকে আসাম যেতে হবে। প্রকাশও সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। সেও আগামীকাল যাচ্ছে।

সমবেত বন্ধুদের মজলিসে উদাসীনতা। মমতাজের চোখে লালিমার আস্তরণ। হামিদ আজ সিগারেটের পরিবর্তে সিগার পান করছে। বোন ওজরার চোখের কমনীয় দৃষ্টির অনুনয় আরো গভীর আরো প্রশান্ত মধুর। তার চোখের মণি আজ রহস্যাবৃত।

যে মোবির মুখে কথার খই ফুটতো, সেই মোবি আজ নীরব।

পারভেজ সিগারেটে অগ্নি-সংযোগ করতে করতে বললো, তুমি তো পার্ল হারবারের জন্যে লড়ছো মোবি, কিন্তু এই প্রকাশ কেন লড়ছে?

শাম বললো, আচ্ছা, আজ যদি আমার পরিধানে সামরিক বাহিনীর উর্দি থাকতো! কিন্তু মনে কোন চাঞ্চল্য, কোন আকাঙ্খা, কোন উৎসাহ উদ্দীপনা অনুভব করছি না। নিজেদের এ পরাধীনতার প্রতিশোধ কার কাছ থেকে নেব? জাপানীদের কাছ থেকে? যেহেতু তারা ফ্যাসিবাদী, এ কারণে? ইংরেজ নিজের দেশে গণতন্ত্রী ঠিকই, কিন্তু এদেশে তাদের কাজকর্মে তো তারা নিজেদের ফ্যাসিস্ট প্রমাণ করছে। সত্যি বল তো মোবি, তুমি কেন লড়তে যাচ্ছো? তুমি তো মায়ের একমাত্র সন্তান।

মোবি আট বোতল 'পে-রাঠ' মদ বের করে টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বললো, এ বিয়ার আমি আজকের দিনের জন্যে সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম। আজ সেদিন এসেছে।

শাম চাকু দিয়ে একটি বোতলের মুখ ছিদ্র করলে সাথে সাথে ফিনকি দিয়ে সোনালী পানীয়ের কিছু অংশ তার মুখে এসে পড়লো। তাড়াতাড়ি সে মদ শাম গ্লাসে ঢালতে লাগলো। সমুদ্রের বেলাভূমিতে বালির উপর আছড়ে পড়া ফেনাপুঞ্জের মতো সোনালী পানীয়ের ফেনা গ্লাস উপচে পড়তে চাচ্ছিলো।

শাম মোবিকে বললো, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি।

প্রকাশ আবেগ উচ্ছল কণ্ঠে বললো, আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি বলছি, কেন আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

পারভেজ বললো, যাচ্ছ এ কারণে, কারণ তুমি একটা নির্বোধ, হাবা। ইংরেজ হিন্দুদের হিন্দুস্থানও দেবে না, মুসলমানদের পাকিস্তানও দেবে না। তারা উভয়কে বোকা বানাচ্ছে। মূর্খ কোথাকার।

—ওকে বলতে দাও। মমতাজ বললো, ওর কথাও শুনে নিতে দাও। মমতাজের চোখে অশ্রু চিকচিক করে উঠলো।

প্রকাশ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে মমতাজের প্রতি তাকিয়ে বললো, আমি মরতে

যাচ্ছি। আর ফিরে আসবো না। আমি জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রক্ত দিতে যাচ্ছি।

সবাই হেসে ফেললো। মোবি গম্ভীরভাবে চুপচাপ প্রকাশের কথা শুনতে লাগলো।

প্রকাশ বললো, পে-রাষ্ট নামের মদ পেয়েছি। এর স্বাদ গ্রহণের জন্যে জিহবা শুকিয়ে আছে।

হামিদ বললো সাবাস খোকা। মৃত্যুর আগে প্রাণ ভরে পিয়ে নাও।

প্রকাশ আত্মগত স্বরে বললো, মনস্তাত্ত্বিক দোটানায় পড়ে আমি ভাবতাম—কি করবো। ইংরেজ ফ্যাসিবাদও ভালো নয়। তা'হলে, কি করবো? স্তব্ধ বিমূঢ় হয়ে বসে থাকতাম। মনের এ অস্থির জিজ্ঞাসার জবাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারতাম না। নিজের দেশে ইংরেজ এবং জাপানীদের লড়তে দেখেছি, নিজের ক্ষেত-খামার, গ্রাম-শহর ধ্বংস হতে দেখেছি। অথচ হাতের উপর হাত রেখে চুপচাপ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে আছি। পরাধীনতার পর আসে লজ্জাহীনতার মঞ্জিল, সেই মঞ্জিলে পৌঁছে প্রতি জাতিই নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। গোলামী থেকে আজাদী, পরাধীনতা থেকেই স্বাধীনতা প্রাপ্তি সম্ভব। কিন্তু যখন কোন জাতি পরাধীনতার সীমা অতিক্রম করে নির্লজ্জতা নিষ্ক্রিয়তা এবং অকর্মণ্যতার প্রমাণ দিতে শুরু করে, তখন তারা কিছুতেই আর স্বাধীন হতে পারে না। এ কারণেই আমি জাপানী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের রক্ত প্রবাহিত করে দিতে চাই। আমার এ পদক্ষেপ ফ্যাসিবাদের সমগ্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হবে—সেই ফ্যাসিবাদ পৃথিবীর যে কোন অংশেই আত্মপ্রকাশ করুক না কেন।.....আমার মৃত্যু আমার লড়াই সেই ফ্যাসিবাদকে অবশ্যই কমিয়ে দেবে, যেই ফ্যাসিবাদের প্রতিক্রিয়া আমরা নিজের ঘরে বসেও দেখতে পাই।

প্রকাশ থামলো। তার চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। বিয়ারের গ্লাস সে অধরে ছোঁয়ালো।

পারভেজ বললো, ফিরিঙ্গিদের সাথে কেন লড়ছো না? তারাও তো আর মখমল নয়, রেশম নয়।

হামিদ বললো, প্রকাশ সম্ভবতঃ দুই ফ্রন্টে একই সময়ে লড়তে চায় না। হিটলারের পরিণতি তো তোমরা প্রত্যক্ষ করছো।

সবাই হাসতে লাগলো। কিন্তু মোবির কোন ভাবান্তর নেই। সে চুপ করে রইলো।

শাম বললো, ভূতনী কোথাকার! তুমি কিছু বলবে না?

মোবি বললো, রাজনীতি বিষয়ক আলোচনায় আমি নীরব থাকবো। আমাকে যেরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যথা সম্ভব সে নির্দেশ পালন করবো। তবে হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি, আমার আসার সময় ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে আমাকে এমন কিছু কথা বলা হয়েছে যেসব কথা অভিজ্ঞতার নিরিখে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। সে সব কথা আমার এখানে উল্লেখ না করাই সমীচীন এবং স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আমি—আমি ফ্রন্টে যাচ্ছি।

সবাই চুপচাপ মোবির কথা শুনছিল।

মোবি বললো, আমাকে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় মেয়েরা নিতান্ত ভীরু। তারা অন্তঃপুরবাসিনী, তারা শ্বেতাঙ্গদের ছায়া দেখলেও ভয় পায়। কিন্তু এখন আমি জানি বাস্তব সত্য কি। তারা অন্তঃপুরে থাকে, তারা লজ্জাশীলা, কিন্তু ভীরু নয়। তারা তোমাদের পুরুষদের চেয়ে অধিক সাহসিকতার অধিকারিণী। প্রয়োজনে তারা মৃত্যুর মোকাবিলাও করতে পারে।

হামিদ ব্যঙ্গাত্মকভাবে বললো, মোবি নয়, সাপের বিষ কথা বলছে।

মোবি বললো, প্রত্যেক মানুষই অন্যের খারাপ কথা শুনতে চায় এবং সেসব বিশ্বাস করতে চায়। এটা মানুষের স্বভাব। আমিও তোমাদের সম্পর্কে অনেক খারাপ কথা শুনেছি এবং সেসব বিশ্বাসও করেছি। শায়মী, সেই উপহার-উপঢৌকন সম্পর্কিত কথা তোমার মনে থেকে থাকবে। আমাকে হয়তো কমিনা মনে করবে। কিন্তু এটা বাস্তব ব্যাপার যে, আমি আজ পর্যন্ত তোমার কর্মধারা সেই মানদণ্ডেই বিচার করেছি। কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

—কিভাবে ভ্রান্ত হলো? শাম বললো, ভূতনী কোথাকার! এই যে, 'পে-রাষ্ট' খাওয়াচ্ছো। এর একটি বোতলের দামই তো চল্লিশ

টাকা। এরপরও বলছো, আমরা কোন আর্থিক লাভ গ্রহণ করি না! মদ খেলে কি তোমার এমনি ধরনের নেশা ধরে যায়?

মোবি হেসে বললো, আমি রাজনীতি জানি না। শুধু মন দেখি। মন চিনি। আমি নিতান্ত ভালভাবে তোমাদের মনের পরিচয় নিয়েছি। আমি যখন আমেরিকা ফিরে যাব, তখন……

—তখন কি হবে? পারভেজ জিজ্ঞেস করলো।

মোবি বললো, কিছু না। শোনো ঐ যে মনে হয় কোথায় যেন ঘুঘু ডাকছে।

—ঘুঘু ডাকছে? এখানে? মোবি, এটা তোমার মনের ভুল। এখানে পশ্চিমঘাটে ঘুঘু ডাকতে পারে না। পারভেজ বললো।

খানিক পর মোবি ধীরে ধীরে বললো, কিন্তু অবিকল সেই আওয়াজ। এ গীতিধ্বনি দূরে কোথাও থেকে ভেসে আসছে। মোবির চোখ স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে উঠলো।

—নিউইয়র্ক থেকে কি? শাম জিজ্ঞেস করলো।

—হ্যাঁ, নিউইয়র্ক থেকেও আসতে পারে। সেখানে আমার প্রিয়তমা থাকে। ওহিও থেকেও আসতে পারে। সেখানে আমার মা থাকেন। মোবি স্মৃতির রাজ্যে হারিয়ে গেল। তারপর স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে বললো, এই ম্যাগনোলিয়ার সাদা গুচ্ছ আমার প্রিয়তমার মুখমণ্ডলের মতো সজীব, আমার মায়ের শুভ্র কেশরাজির মতো পবিত্র। মোবি ফুলদানি থেকে ম্যাগনোলিয়ার সাদা গুচ্ছ ধীর মোলায়েম ভঙ্গিতে সোহাগ করার ভঙ্গিতে স্পর্শ করলো।

প্রকাশ ফোঁপাতে লাগলো।

মোবি বললো, শাম আমি সত্যি বলছি, আমি পার্ল হারবারের জন্যে লড়াই করছি না। চিন্তিত ভঙ্গিতে সে বললো, আমি—সম্ভবতঃ এই সাদা ফুল গুচ্ছের জন্যে লড়াই করছি। এ কথা বলে মোবি ম্যাগনোলিয়া ফুলের সাদা গুচ্ছ নিজের চেহারায় ছোঁয়ালো।

সবাই নীরব, কেউ কোন কথা বললো না। চারদিকে রাতের নীরবতা ছেয়ে আছে। শুধু মদের ফেনা বাকি আছে। দূরে—অনেক দূরে কোথায় যেন ঘুঘু ডাকছে, সে ডাক ভেসে আসছে।

কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পরও মোবির কোন চিঠি এলো না। সম্ভবতঃ সেন্সরের কারণে দেরী হচ্ছে। প্রকাশ ভালো আছে।

তারপর জানা গেল যে, প্রকাশ জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে মারা গেছে। কিন্তু মোবির তখনো কোন খবর এল না।

পারভেজ বললো, ওসব আমেরিকানদের বিশ্বাস কি? এখানে কি রকম অন্তরঙ্গতা দেখালো, আর ওখানে গিয়ে……। সিগারেট ধরিয়ে ছাইদানীতে ছাই ফেলে এমন ভঙ্গি করলো যে, মোবিকে চিরতরে সে তার মন থেকে মুছে ফেললো।

কয়েক সপ্তাহ যাবত মমতাজের চোখে-মুখে উদাসীনতার ছাপ লক্ষ্য করা গেল। তারপর সেও মোবিকে ভুলে গেল। হঠাৎ করে শাম টাইফয়েডে আক্রান্ত হলো এবং রোগশয্যায় সে সেন্সরকৃত একখানা চিঠি পেল। চিঠিখানা ওহিও থেকে এসেছে। চিঠি খুলতে খুলতে শাম ভাবলো বদমাশটা ওহিও ফিরে গেছে এবং ……

চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

প্রিয় খোকা,

আমি তোমাকে নিজের সন্তান বলে সম্বোধন করছি, কারণ তুমি আমার মোবির বন্ধু। আমি তোমাকে চিঠিও লিখছি এ কারণে যে, তুমি মোবির বন্ধু। সম্ভবতঃ তুমি তোমার মাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে। মৃত্যুর আগে মোবি তার অসিয়তনামায় লিখেছে যে, ভিটল ওয়াড়িতে সে একটি মেয়েকে নিজের যোন হিসেবে মনে মনে গ্রহণ করেছে। মেয়েটির নাম হচ্ছে মোহিনী। মোবি লিখেছে, সেই মেয়েটিকে তুমি নাকি ভালো করে চেন। মোবি তো এখন আর এ পৃথিবীতে নেই। আমার এ নিঃসঙ্গতার সময়ে তুমি কি আমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারো না?

যদি কোন কারণে এটা সম্ভব না হয়, তবু আমাকে লিখে জানাবে। তাহলে আমি নিজে ভারতে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবো। যদি বেঁচে থাকি তাহলে অবশ্যই আমি একবার সেখানে যাব। আমি মোহিনীর সাথে দেখা করতে চাই। যদি সম্ভব হয় তবে তাকে সাথে

নিয়ে আসতে চাই। এটা কি সম্ভব হবে?

একজন মার্কিন মহিলার এ কল্পনা-বিলাসকে তুমি হয়তো ভুল বুঝবে, এবং ক্ষণিকের ভাবাবেগ বলেও ব্যাখ্যা করতে চাইবে। কিন্তু এটা ক্ষণিকের আবেগ বা উচ্ছ্বাস নয়, কল্পনা বিলাসও নয়, বরং এটা সেই সুন্দর সত্যের বাস্তবতা, যেই সুন্দর সত্যকে আমার সন্তান মোবি নিজের রক্ত দান করে অর্জন করেছে। মোবি ছিল আমার একমাত্র সন্তান। নিজের সর্বশেষ চিঠিতে মোবি লিখেছিল, যেদিন মোহিনী আমার হাঁটু থেকে সাপের বিষ চুষে ফেলে দিয়েছিল সেদিন তার মনে হয়েছিল যে, মোহিনী তার দেহ থেকে নয় বরং আত্মা থেকে সে বিষ চুষে বাইরে ফেলে দিয়েছে—যে বিষ কৃষ্ণাঙ্গকে শ্বেতাঙ্গ থেকে, দরিদ্রকে ধনী থেকে, মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মোবি ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে, ভালোবাসা প্রতিটি সুন্দর মানব সমাজের প্রথম ও শেষ শর্ত। এই ভালোবাসা তথা প্রেম ছাড়া পৃথিবীকে, কোন মানব সমাজকে মূল্যায়নের নিক্তিতে ওজন করা যায় না। ভিটল ওয়াড়ির সেনা-ছাউনিতে মোবি প্রথম অনুভব করেছিল যে, প্রেম-ভালোবাসার কোন রং কোন বর্ণ হয় না, কোন দেশ হয় না, কোন ধর্ম হয় না। প্রেম-ভালোবাসা হচ্ছে জীবনের শেষ ও চিরন্তন আদর্শ। আসাম যাত্রার প্রাক্কালে মোবি এসব কথা তোমাদের বলতে চেয়েছিল। জানাতে চেয়েছিল যে সে এই ভালোবাসার জন্যেই, এই প্রেমের জন্যেই লড়াই করছে। মানুষ থেকে সৃষ্ট ভালোবাসার জন্যে, ফ্যাসিবাদ সৃষ্ট ঘৃণার বিরোধিতা করার জন্যে সে লড়াই করছে। সে ভেবেছিল এসব কথা সে যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তোমাদেরকে এবং তার দেশবাসীকে জানাবে। কিন্তু এখন তার লাশ আসামের কোন এক প্রান্তরের মাটির নীচে লুকানো রয়েছে। তার মাথার উপর রয়েছে মৃত্যুর ক্রুশচিহ্ন।

সন্তানের মৃত্যুতে প্রত্যেক মা-ই শোকাহত হয়ে পড়েন। মোবি ছিল আমার একমাত্র সন্তান। কিন্তু স্রষ্টার ইচ্ছা ছিল যে, সে আমার কাছ থেকে এভাবে হারিয়ে যাবে। তবে মোবির শেষ চিঠি পড়ে আমার মনে হয়েছে, মোবি কোথাও হারায়নি, যেন এখনো সে আমার কাছে

বসে আছে, এবং হেসে হেসে আমাকে বলছে, দেখো মা, তোমার জন্যে একটি কন্যা নিয়ে এসেছি। মোবির চিঠি পড়ে আজ পুনরায় আমি তাকে প্রসব করার অসামান্য যন্ত্রণা ও আনন্দ একই সাথে অনুভব করছি।

আজ এ পর্যন্ত। আর কিছু লিখছি না।

তোমার মা

ইস্‌থার

পারভেজও শামের কাছে ঝুঁকে পড়ে চিঠি পড়ছিল। চিঠি পড়া শেষ হলে তার আঙ্গুল শামের হাত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলো। মুখে সে উচ্চারণ করলো, মোবি!

শাম মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অশ্রু মুছে কম্পিত হাতে ম্যাগনোলিয়া ফুলের গুচ্ছ নিজের চেহারায় স্পর্শ করলো।

চারদিকে রাতের গহীন নীরবতা ছেয়ে আছে। শুধু দূর অনেক দূর থেকে ঘুঘুর ডাক ভেসে আসছে।

——

মিনা বাজার

দু'জন প্রেমিকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, তা-ও যদি আবার দু'জনই আই. সি. এস. হয়—খুবই কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু রম্ভা এ কাজ সুনিপুণভাবে সমাধা করতে পারতো। নতুন প্রেমিকদের মনতুষ্টিতে রম্ভার জুড়ি মেলা ভার। সে ছিল অসামান্যা সুন্দরী, তার প্রীতিময় মায়াবী চেহারা ছিল আর্ট ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদের মতোই আকর্ষণীয়। গায়ের চামড়া নাইলনের মতো নিষ্কলুষ মোলায়েম। দেহ সৌষ্ঠব নতুন মডেলের গাড়ীর মতো। অন্যান্য মেয়েদের দেখে মনে হতো যে তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে সম্ভবতঃ যাচ্ছেতাই ভাবে লালন-পালন করেছে, কিন্তু রম্ভাকে দেখে মনে হতো তাকে আধুনিক যে কোন কারখানায় ঢেলে সাজানো হয়েছে। তার দেহের গঠন, ঠোঁট, নাক, কান, চোখ, নাট-বল্টু ইত্যাদি সবকিছু যথাস্থানে এমনভাবে সুবিন্যস্ত ছিল যে দেখে মন চাইতো রম্ভার কাছে তার মেকার এবং ম্যানুফেকচারারের নাম জিজ্ঞেস করে তাঁকে শীঘ্রই এ ধরনের এগার হাজার মেয়ে সরবরাহের কথা বলতে হবে।

যমুনা রম্ভার মতো সুন্দরী ছিল না বটে কিন্তু দেহে শিহরণ তুলে সে এমনভাবে চলাচল করতো যে দেখে মনে হতো যেন ঝিলের হালকা ঢেউ পরস্পরের সাথে খেলা করছে। তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিল সঙ্গীতের মতো মাধুরীমণ্ডিত। ষ্টেশনের মল রোডে যখন পায়চারী করতে বেরোত তখন তার দেহের বাঁক দেখে সবাই বিস্ময় হয়ে যেতো।

জোবেদার কণ্ঠস্বর ছিল খুবই মিষ্টি, তাকে হাইনি রেডিও কোম্পানীর তৈরী রেডিওর সাথে তুলনা করা যেতো। তাছাড়া তাকে দেখে কোন নারী নয় বরং গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডের কথা মনে আসতো। সব সময় তার মুখে হাসি লেগে থাকতো। তার শ্যামল রঙের উপর তার সাদা দাঁত খুবই ভালো লাগতো, শব্দ করে হাসলে মনে হতো হালকা কাঁচের গ্লাস বুঝি পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে গেছে। এ ধরনের মেয়ের সাথে ক্লাবে বসে মদ না খেয়েই লোকেরা নেশাগ্রস্ত হয়ে যেতো।

মৃণালিনীর চোখ উদাস প্রকৃতির, ঠোঁট ছিল খুবই সুন্দর। তার চোখের উদাস চাহনি ছিল হালকা রঙের গালিচার মতো মোলায়েম। সে চোখের চাহনি দেখে মনে হতো যে জীবনের কণ্টকাকীর্ণ পথে হেঁটে গিয়ে সেই ছায়াঘেরা বৃক্ষের তলায় কিছুক্ষণের জন্যে আরাম করা যাক। তাকে দেখে চায়না পিক যাওয়ার পথে ঘন দেওয়াল আচ্ছাদিত যে রেস্তোরাঁ পড়তো সে রেস্তোরাঁর কথা মনে হতো—যে রেস্তোরাঁর সামনে অস্পষ্ট আলোর মধ্যে মার্জিত রুচি বেয়ারা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আরো মনে পড়তো তাজা লজেন্সের কথা। সে রেস্তোরাঁয় বসে বসে অনেকে প্রেমোচ্ছ্বাসবশতঃ মৃণালিনীর কথা ভেবে মৃণালিনীকে দেখে তাদের বহুবার সে রেস্তোরাঁর কথাও মনে এসেছে। কোন কোন নারী এমনি রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয়ে থাকে।

রোজ গোলাপ ছিল না বটে তবে প্রজাপতি ছিল, প্রজাপতির মতো ছুটোছুটি করতো তবে পুরুষদের পাশে নয়। ডান হলে রক্ এন রোল থেকে শুরু করে আধুনিক নাচ পর্যন্ত সকল নাচই সে জানতো। তার প্রেমিক ছিল মাত্র একজন অথচ কয়েকজন হতে পারতো। কিন্তু সে দু'বছর থেকে মাত্র একজন প্রেমিকের উপরই ধৈর্য ধরে আছে, কারণ সে তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। বিয়ের জন্যে তো ধৈর্যধারণ করা অপরিহার্য। প্রেমিক হলেও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই। রোজ পিটারের উপর নির্ভর করেছিল, কিন্তু পিটার এতো ধৈর্য ধরতে চাইত না। কারণ সে ছিল রোজের চেয়েও ভাল ড্যান্সার এবং আই. সি. এস. অফিসার। তার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে রম্ভার মতো মেয়েও তাকে লিফট দিতে শুরু করেছিল। যদিও রোজ রম্ভাকে নিজের চেয়েও কিছুতেই ভাল মনে করতে প্রস্তুত ছিল না। রোজের দেহ ছিল বারো বছরের মেয়ের মতোই হালকা-পাতলা, তার কণ্ঠস্বরও ছিল কচি খুকীর মতো। তার ছোট ছোট চুল খুবই সুন্দর দেখাতো। সে চুল দেখে কোন অর্কেষ্ট্রার কথা মনে পড়তো। তার দেহ ছিল জেট বিমানের মতো। কাজেই সে ভাবতো পিটারকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে রম্ভা? অসম্ভব।

এক সময়ের কিলা চাঁদ স্বামীর নিকট থেকে তালাক নিয়ে ইলা হয়েছে।

নিজের নেপালী সৌন্দর্যে আজো সে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। তার সৌন্দর্যে এক নতুন ধরনের বৈশিষ্ট্য ছিল। ইলার পোষাক-পরিচ্ছদ হাই সোসাইটিতে বিখ্যাত ছিল, তা দিয়ে সে সৌন্দর্যের ঘাটতি পূরণ করতো। মূল্যবান শাড়ী ছাড়াও তার কাছে অতিরিক্ত অলংকারের সেট ছিল। পাঁচ বছর আগে সে সিমলা ও দার্জিলিং এ দু'টি সুন্দরী প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিল। কিছু সংখ্যক লোকের মতে যদিও সে ছিল পুরনো মডেলের গাড়ীর মতো, কিন্তু ক্রমাগত ধোয়া-মোছা ও খেয়াল যত্ন মালিশে তার পূর্ব সৌন্দর্য এখনো ছিল অটুট।

হিল ষ্টেশনের চীফ কমিশনারের তিনটি মেয়ে রয়েছে, তাদের জন্যে কমিশনার সাহেব যোগ্য পাত্র খুঁজছেন। তাদের নাম যথাক্রমে সুধা, মাধুরী ও আশা। এদের তিন জনের মধ্যে আশাকে স্বাভাবিকভাবেই কুরূপাদের শ্রেণীতে শামিল করা যায়। তবে সুধা ও মাধুরী যদিও সুন্দরী ছিল না তবু তাদের আকর্ষণ মানানসই ছিল। কিন্তু তারা যেহেতু কমিশনার সাহেবের মেয়ে এজন্যে তাদেরও সুন্দরীদের শ্রেণী তালিকাভুক্ত করা হলো। এটা ঠিক আজকালকার মন্ত্রীদের বক্তৃতাকে সাহিত্যকর্ম মনে করার মতো ব্যাপার।

এরা ছাড়াও সীতা মালহোত্রা, বারজেস আবদুর রহমান, যেলিসার কোর, পেশারাযাদান, খুরশীদ গোরওয়ালা, মেজর আনন্দ-এর মেয়ে গৌরী প্রমুখও বার্ষিক সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছিল। ক্লাবের লনে এ প্রতিযোগিতা কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে। হিল ষ্টেশনের জন্যে এটা যেন সবচেয়ে বড় জাতীয় উৎসব। প্রতিযোগিতার তারিখে ক্লাবের লনে অগণিত জনসমাগম ঘটে। রং-বেরঙের শাড়ী পরিহিতা মেয়েরা, সোনালী বিয়ারে ভরা গ্লাস, অংশগ্রহণকারিণী মেয়েদের ভয় মেশানো চাহনি, হাসি, প্রেমিক ও পিতা-মাতার শংকা-দোদুল মনোভাব, শেষ মুহূর্তে ব্লাউজ শাড়ী পাল্টানো, আয়না দেখে দেখে ভ্রূভঙ্গি তীক্ষ্ণকরণ —বাপরে! এই সুন্দরী প্রতিযোগিতা আই. সি. এস. প্রতিযোগিতার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আর কিছু না হোক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারিণী অনায়াসে যোগ্য স্বামী পেয়ে যায়। এজন্যে প্রতি বছরে কয়েক ডজন মেয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং পিতা-মাতা সানন্দে

তাদের অনুমতি দেয়।

আজ সুন্দরী প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন। বিচারকদের মধ্যে একজন হলেন রোহিলাখণ্ডের প্রাক্তন বিভাগীয় চীফ কমিশনার কুমার চন্দ্র সিং। অন্যজন হলেন স্যার সোনার চাঁদ। তাঁর মুশায়েরা ও কবি সম্মেলন প্রতি বছর সাড়ম্বরে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। মুশায়েরা ও কবি সম্মেলন যিনি সফল করতে পারেন তিনি মেয়েদের যাচাই-এর ব্যাপারেও নিঃসন্দেহে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন এই ভেবে তাঁকে বিচারকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা বিচারে ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সাবেক বিচারপতি দেশ পাণ্ডেকেও বিচারক কমিটিতে রাখা হয়েছে। অন্য একজন বিচারক হলেন সৈয়দ ইমতিয়াজ হোসেন থার-এট-ল। প্রতিদিন স্ত্রীর গায়ে হাত তোলার ব্যাপারে তার খ্যাতি রয়েছে। পঞ্চম বিচারক হলেন বিশিষ্ট ধনী দেওয়ান বেলোয়াজ শাহ্। স্ত্রীর হাতে প্রতিদিন মার খাওয়ার জন্যে তার খ্যাতি রয়েছে। বিচারক দলে অন্তর্ভুক্তির জন্যে আরো দু'জনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। একজন হলেন বিশিষ্ট হিন্দী কবি কুঞ্জবিহারী শর্মা, মেয়েদের সৌন্দর্য সম্পর্কে ব্রজ ভাষায় তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখেছেন। অন্যজন হলেন কুমার জুয়েলার্স-এর প্রোপাইটার কমর উদ্দিন কোরেশী। সমগ্র ইউপিতে তার চেয়ে ভালো অলংকার নাকি আর কেউ তৈরী করতে পারে না। শেষোক্ত দু'জন বিত্তশালী না হওয়ার কারণে ভোটে পরাজিত হন। বিচারকমণ্ডলীতে কোন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে কোন নারীই অন্যকে নিজের চাইতে বেশী সুন্দরী মনে করে না। তাছাড়া তাদের বিবেচনা জ্ঞানও ততোটা সূক্ষ্ম নয়। এজন্যে বহু বিতর্কের পর কোন নারীকে বিচারক কমিটিতে না রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশেষে প্রথমোক্ত পাঁচজনকেই চূড়ান্ত বিচারের ভার প্রদান করা হয়।

দিনটি ছিল খুবই মনোহর, উজ্জ্বল আকাশে সাদা মেঘের মিনার। ক্লাবের লনও ছিল মনোরম। মনে হচ্ছিল যেন মির্জাপুর ফ্যাক্টরীর সবুজ গালিচা। ছোট শিশুদের পরিচ্ছন্নতা দেখে তাদের প্লাষ্টিকের তৈরী বলে মনে হচ্ছিল। প্রশস্ত লনের চারদিকে নানারঙের ফুল এমনভাবে সাজানো

রয়েছে মনে হচ্ছে যেন কাগজ কেটে কেটে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। মোট-কথা খুবই সুন্দর মনোরম দৃশ্য।

সর্বপ্রথম লনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘোষক একটা ঘণ্টা বাজালেন। তৃতীয় বারের ঘণ্টা শুনে ক্লাবের বিভিন্ন কামরা থেকে সবাই দলে দলে বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। লনের এক পাশে সোফা ও চেয়ার পেতে দেয়া হয়েছে। প্রথম কাতারের সোফায় পাঁচজন বিচারক বসলেন, তাঁদের পেছনে ক্লাবের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, তাঁদের পেছনে বিশেষ ও সাধারণ ভদ্র-লোকবৃন্দ, সব শেষে আমাদের মত মূর্খ সাধারণ লোকেরা কাঠের বেঞ্চিতে উঠে দাঁড়াল এবং কথায় কথায় হাসতে লাগলো। অবশেষে জোরে জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোষক সবাইকে চুপ করালো।

বিচারপতি দেশপাণ্ডে প্রতিযোগিতায় চূড়ান্তভাবে অংশ গ্রহণকারিণী মেয়েদের নাম পড়ে শোনালেন। তারপর ব্যাণ্ড বাজতে শুরু করলো। ব্যাণ্ডের শব্দে সব দর্শক সিঁড়ির প্রতি অপলকে তাকিয়ে রইল। সে সিঁড়ি দিয়ে মেকআপ রুম থেকে প্রতিযোগিনীরা বিচারকদের সামনে আসবে। সিঁড়ি-পথ থেকে বিচারকদের সামনে পর্যন্ত একটি লম্বা গালিচা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। সে গালিচার উপর দিয়ে প্রত্যেক সুন্দরী তাদের নিজস্ব বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে। এ সময়ে দর্শকদের অনেকে দূরবিন বের করে নিলেন।

সর্বাগ্রে ইলা গাঢ় লাল পেড়ে শাড়ী পরিধান করে নানা প্রকার ভঙ্গি-সহকারে সিঁড়ি থেকে নীচে নেমে এলো। বহু দূর পর্যন্ত বাতাসে সুবাস ছড়িয়ে পড়ল। ইলার মুখে বিজয়িনীর অদ্ভুত হাসি খেলা করছিল। বিচারকদের সামনে এসে সে অপূর্ব ভঙ্গিতে নিজেকে প্রদর্শন করালো, তার কানের ইয়াকুত পাথরের অলংকার চমকাতে লাগলো। তারপর সামনে হাত বাড়িয়ে সেব-এর শাখার মত শাড়ীর আঁচল সামনে নিয়ে দর্শকদের প্রাণে তরঙ্গাভিঘাত তুলে ফিরে গেল।

জোবেদা আবির্ভূত হলো সেকালের রাজকুমারীদের রূপে। বিলোল কটাক্ষ, লক্ষ্ণৌর তৈরী হালকা রঙের ফুল আঁকা কামিজ, তার উপর ঝালর দোলানো দোপাট্টা, তার উপর জোবেদার ঘাড়। সে ঘাড় দেখে সেই

ঘাড়ের সোরাহী উল্টে দিয়ে তার সব মদ খেয়ে নিতে ইচ্ছে হতো। সে ঘাড়ের উপর শোভিত জোবেদার প্রিয়দর্শন কচি লাবণ্যময় চেহারা। অপূর্ব ভঙ্গিতে ধীর শান্ত ভাবে সে বিচারকের সামনে এলো এবং ঘাড় তুলে হাসলো। তার সাদা সাদা সুন্দর দাঁত বিজলীর মত চমকে উঠলো।

গাঢ় সবুজ রঙের জাম্পারের উপর হলুদ রঙের ব্লাউজ পরিধান করে রোজ এগিয়ে এলো। তার উঁচু বুক। আন্দোলিত কোমর, লম্বা পায়ে মন-মাতানো ছন্দ দেখে ফটোগ্রাফাররা এগিয়ে এসে ছবি তুলতে লাগলো, দর্শকরা বাহ্‌বা দিয়ে হাততালি দিলো। মৃদুহাসিনী রোজ একটুখানি ঝুঁকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে গেলো।

তারপর একে একে সুধা, মেহতা ও মাধুরী এলো। উভয়ে যা ছিল ঠিকই ছিল। ভালোও নয় আবার খারাপও নয়, কিন্তু যেহেতু তারা ছিল চীফ কমিশনার সাহেবের মেয়ে এজন্যে সামনের সারির বিশিষ্ট অতিথিরা হাততালি দিয়ে তাদের স্বাগত জানালো। তাদের যাওয়ার পর আশা মেহতা এলে কারো তালি বাজানোর সাহস হলো না। সে এতো কুৎসিত ছিল যে মেক-আপও তার কোন পরিবর্তন আনতে পারল না। ঘাড় ফিরিয়ে তার চলে যাওয়ার পর সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

মিতা মালহোত্রা টিস্যু রঙের একখানা সোনালী বেনারসী শাড়ী পরিধান করে এলো। বেনারসীর নীচের পেটিকোট ছিল খুবই সুন্দর, পেটিকোট যদি নাইলনের হয় তবে তার উপর নজর পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

মৃণালিনী তার দেবদাসীদের মতো চুল উপরে তুলে সিঁউলি ফুল সাজালো, কোন প্রকার মেক-আপ সে গ্রহণ করেনি। সে শুধু চোখে কাজলের গভীর একটু প্রলেপ দিয়েছিল। এ কাজল তার ডাগর চোখের উদাস সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিচারকদের কাছে এসে সে তাদের প্রতি এমনভাবে তাকালো যেন বনহরিণী শহরে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে। অথবা যমুনা দেবদাসের জন্যে কাঁদছে। মৃণালিনীও কিছুক্ষণ পর ফিরে গেলো। তারপর একে একে যমুনা, বারজেস, যুবশীদ, গোরী, প্রমুখ বাইরে এলো এবং নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গি প্রদর্শন করে ফিরে

গেল। সব শেষে এলো রম্ভা, সে বেরিয়ে আসতেই ব্যাণ্ড জোরে জোরে বেজে উঠলো। দর্শকদের বুক দুরু দুরু কাঁপতে লাগলো। রম্ভা চোস্ত পাঞ্জাবী কামিজ ও সেলোয়ার পরিধান করেছিল, এ পোষাক তার দেহে এমন আটসাঁট হলো যে দেখে মনে হচ্ছিল যেন সাঁতারুদের পোষাক। পোষাকের উপর দিয়ে তার দেহের প্রতিটি বাঁক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে সে গোড়ালীর উপরে বাঁধা ছোট ছোট ঘুঙুরে শব্দ তুলে হেঁটে যাচ্ছিল, দর্শকরা বাহবা দিল, চারদিক থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বারি বর্ষিত হতে লাগলো। এবার যে রম্ভা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নির্বাচিত হবে এতে আর কারো সন্দেহ রইল না।

সব মেয়েদের চলে যাওয়ার পর বিচারকমণ্ডলী পাশের একটি কামরায় আলোচনার জন্যে মিলিত হলেন। তাদের উঠে যাওয়ার পর দর্শকদের হৈচৈ বেড়ে গেলো, সবাই নিজ নিজ পছন্দ মতো প্রথমা, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া নির্বাচন করছিলো। প্রত্যেক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে, প্রত্যেক মা তার মেয়েকে মনোনীত করছিল। তবে অধিকাংশ দর্শক ছিল রম্ভার স্বপক্ষে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের সম্ভাব্য অধিকারিণীও তারা মনোনীত করে ফেললো। কারো মতে যমুনা, কারো মতে জোবেদা, কারো মতে বারজেস অমুক অমুক পুরস্কার লাভ করবে।

পনের-বিশ মিনিট পর বিচারকমণ্ডলী তাদের আলোচনা শেষ করে বেরোলেন। প্রাক্তন বিচারপতি দেশ পাণ্ডের হাতে এক টুকরো কাগজ, তিনি সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। কাগজের টুকরো নাকের কাছে তুলে ধরে তিনি উচ্চস্বরে বললেন, বিচারকমণ্ডলীর সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেছে সুন্দরী রাণী মিস সুধা মেহতা, দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে মিস মাধুরী মেহতা। তৃতীয় স্থান লাভ করেছে মিস জোবেদা।

চীফ কমিশনার মেহতার ঘরে দারুণ অসন্তোষ বিরাজ করছে। আশা মেহতা কেঁদে কেঁদে অবস্থা সঙ্গিন করে তুলেছে। বিকেলে চীফ কমিশনার সাহেব ক্লাব থেকে এলে তার স্ত্রী তাকে দোরগোড়াতেই আক্রমণ করলেন। বললেন, হায়! আমার মেয়ে দুপুর থেকে কাঁদছে। হায়! তুমি আমার

আমার দিকে একটুও খেয়াল করলে না, তোমার চীফ কমিশনার পদের মুখে আগুন লাগুক। আমার মেয়ে পুরস্কারই যখন পেল না তোমার চীফ কমিশনার হয়ে কি লাভ? সুধা, মাধুরী তবু যাহোক বর পেয়ে যাবে কিন্তু যার প্রতি তোমার বিশেষ নজর রাখা উচিত ছিল, আশা—তার কি হবে, হায় হায় হায়!···

চীফ কমিশনার গর্জন করে বললেন পাগল হয়েছ? তোমার দুই মেয়েকে তো আমি কোন না কোনভাবে পুরস্কার পাইয়ে দিয়েছি, কিন্তু অন্য মেয়েকেও পুরস্কার পাওয়ার ব্যবস্থা করলে লোকে কি বলতো? সুবিচার বলেও তো একটা কথা আছে।

———

চুনি ভাই

চুনি ভাই ওলড ইয়াট ক্লাব, বুরবন ক্লাব এ দু'টির একটিরও সদস্য ছিলেন না, কিন্তু উভয় ক্লাবেই তাঁকে বিশেষ সম্মানের সাথে আমন্ত্রণ জানানো হতো।

গত দু'বছর থেকে অর্থাৎ তার ছোটভাই আয়কর কমিশনার নিযুক্ত হবার পর থেকে ক্লাবের সকল বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁকে এ ব্যাপারে কোন রকম চেষ্টাই করতে হতো না, আমন্ত্রণপত্র তাঁর কাছে ঠিকমত পৌঁছে যেতো। আজ যদি খেমজী, কল্যাণজী, তাদের কোন বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁকে ডাকছেন, তাহলে কালকে স্ট্যাণ্ডার্ড প্লাষ্টিক মিলের মালিক শেঠ দৌলতরাম বাবগা তার মিলে নতুন বিভাগ উদ্বোধন উপলক্ষে ভাইয়াজীকে অংশগ্রহণের জন্য অন্ততঃ পাঁচবার অনুরোধ করছেন। পরশু রাণী হীরাবাঈ ঝাউংকর বুকে এবং ডালে চুনি ভাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমন্ত্রণপত্র নিজের বড় মেয়ে কমলাবাঈ ঝাউংকরকে দিয়ে পাঠিয়েছেন। কমলাবাঈ ভাইয়াজীর হাতে হাত রেখে অপূর্ব ভঙ্গিতে বলে, আসুন ভাইয়াজী, আপনি যদি আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করেন, তাহলে সারাজীবন আপনার সাথে কথা বলব না।

চুনি ভাই কমলার মনোমুগ্ধকর হাসি, তার হাতের কোমল পরশ এবং তার কণ্ঠে ইয়াকুতের মালার উজ্জ্বলতার দিকে তাকিয়ে একটা পোষা কুকুরের মতো বাক্যের লেজ নেড়ে বলেন, বল কি, কেন যাবো না, আমি জী-হ্যাঁ অবশ্যই যাবো। তোমরা ডাকবে আমি যাব না, এটা কি হতে পারে? এটা তো ঠিক সেই প্রচলিত কথার মতো ব্যাপার, সে ঘরে এসেছে এতো আমাদের খোদার মেহেরবানী। কখনো তার দিকে আবার কখনো ঘরের দিকে আমি তাকাই।.....

চুনি ভাইকে ছোট-বড় সবাই ভাইয়াজী বলে সম্বোধন করতো। সকল অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশেষ সম্মান করা হতো এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে

গ্রহণ করা হতো। ধীরে ধীরে সবাই জেনে ফেলল যে, ভাইয়াজী মেয়েদের সান্নিধ্যে খুবই আনন্দ পান, এজন্য সকল অনুষ্ঠানে তার আশেপাশে কয়েকজন সুন্দরী মেয়েকে বসাবার ব্যবস্থা করা হয়। রুক্ষ স্বভাবের সুন্দরী মেয়েরাও ভাইয়াজীর সান্নিধ্যে খুবই প্রীতবোধ করে, তারা এমনভাবে হেসে হেসে কথা বলে যেন তাদের সামনে ভাইয়া নয়, বয় ফ্রেণ্ড। ডায়মণ্ড সেট সাজানো রয়েছে। ভাইয়াজী গুজরাটের অধিবাসী হলেও উত্তর ভারতের একটি ফার্মে দীর্ঘদিন তিনি হিসেব রক্ষকের চাকরি করেছেন। সেখানে বিরাট একটা গোলমাল দেখা দেয়ায় তাঁকে চাকরি থেকে বরিষ্কার করা হয়। গত দু'বছর থেকে তিনি বোম্বেতে পৈতৃক বাড়ী শান্তাক্রুজ-এ অবস্থান করছেন। তিনি যে কি কাজ করেন সেটা কারো জানা ছিল না। তবে দু'বছর থেকেই তিনি নিয়মিত ক্লাবে আসতেন। তাঁর দেহ খাটো, হালকা-পাতলা, কণ্ঠস্বর চাপা, পা কিছুটা বেমানান। ক্লাবের সদস্যরা তাঁর দৃষ্টিকটু চলার ভঙ্গিও পছন্দ করতো। কুমার বলদেব সিং তো একবার তাঁর চলার ভঙ্গিতে খুশী হয়ে বলেছিলেন, ভাইয়াজী, আপনার হাঁটাচলার ভঙ্গি সত্যি অপূর্ব, আমার মনে হয় পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই আপনি রাজা ছিলেন।

একজন কুমারের মুখে নিজের এ প্রশংসা শুনে ভাইয়াজী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন এবং পরদিন থেকে আরো পা ছড়িয়ে এঁকেবেঁকে হাঁটতে শুরু করলেন। ব্যাপারটা ছিল হাস্যকর, কিন্তু ভাইয়াজীর জনপ্রিয়তার কারণে পরিচিত মহলে এ নিয়ে কেউ হাসাহাসি করতো না। দু'বছর আগে তাঁর উপস্থিতিতে অনেকে ভ্রূ কুঁচকাত কিন্তু পরে তারা যখন শুনলো যে ভাইয়াজীর ছোটভাই আয়কর কমিশনার তখন থেকে তাদের মনোভাব পরিবর্তিত হলো এবং তারা তাঁর সাথে এমন আন্তরিকতা মিশিয়ে আলাপ শুরু করলো যেন তিনি তাদের পরিবারের বিশেষ ব্যক্তি।

প্রথম প্রথম ক্লাবে প্রবেশ করার সময় অতিথি হিসেবে পরিচয় দেয়ার পর তাঁকে কার্ড দেখাতে হতো এবং হোস্টের নাম বলার জন্য বাধ্য

করা হতো, অথচ এখন সে সব দূরে থাক, গেটকীপার তাঁকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানায়।

ভাইয়াজী অনেক গুণের অধিকারী, উত্তর ভারতে ক্রমাগত পঁচিশ বছর থাকার কারণে উর্দু কাব্যের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। ক্লাবে আসার পর তো তিনি নিজেও কবি হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম প্রথম গালিব, মোমেন, নাসেখ, দাগ প্রমুখের কবিতা তাঁদেরই নামে শোনাতেন, অথচ এখন উক্ত কবিদের কবিতা নিজের নামেই চালিয়ে দেন। কারণ তিনি ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, সিমেন্ট প্লাষ্টিক ও লোহা ব্যবসায়ী লাখপতিদের কাছে এসব নাম একেবারে নতুন। যারা নিজেদের পাশবুক ছাড়া জীবনে অন্য কোন বই পড়েনি, তাদের কাছে কবি হয়ে যাওয়া খুবই সহজ ব্যাপার। তাছাড়া যারা সারাজীবন আয়কর ফাঁকি দিয়েছে তাদের কাছে কয়েকটা কবিতার ফাঁকিবাজী বড় কথা নয়, এ নিয়ে কেন তারা প্রতিবাদ জানাবে! এ কারণে ক্লাবের শিক্ষিত সদস্যরাও ভাইয়াজীর 'আনকোরা' কবিতা শুনে প্রীত হওয়ার ভান করতো এবং ভাইয়াজীকে মাত্রাছাড়া বাহবা দিত।

কবি ছাড়াও ভাইয়াজী একজন বিশিষ্ট হাস্যরস বিশারদ ছিলেন। যে কোন মজলিশে বসতেন দু'তিনটি হাসির গল্প শোনাতেন। এতে চারদিকে হাসির তুফান ছুটতো এবং ভাইয়াজী নিজের অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তির কথা ভেবে নিজেই বিস্মিত হতেন। ক্রমে তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে তিনি ভাবতেন একজন কবি ও হাস্যরসিক হওয়াই তাঁর এ জনপ্রিয়তার কারণ। তখন থেকে তিনি প্রতিমাসে নিয়মিত ইংরাজী জোকবুক এবং হাসির গল্পের বই কিনতেন এবং সেসব বই থেকে গল্প মুখস্থ করে সবাইকে শোনাতেন। প্রতিবেশী আমীর আলী বেকস-এর সাথে তিনি সখ্যতা স্থাপন করেছিলেন। আমীর ছিলেন কবি, তাঁর কাছে নিয়মিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা আসতো। ভাইয়াজী প্রতিদিন সকালে বেড়াতে বেড়াতে আমীরের বাড়ী যেতেন এবং নতুন পত্রিকা থেকে কবিতা কপি করে এনে ক্লাবে শোনাতেন। সারাজীবন টাকা আনা পাই-এর হিসেব মেলাতে মেলাতে এবং বস-এর ধমক চোখরাঙানি খেতে খেতে ভাইয়াজীর

জীবনে সুদিন এসেছে। এখন তিনি নিজেকে অভিজাত সমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য মনে করছেন। নিজের বিশেষ ব্যক্তিত্বের কারণে তিনি সফলের প্রিয়পাত্রে পরিণত হতে পেরেছেন। তাঁর এতো গুণের ব্যাপারে আগে জানা থাকলে তিনি হিসেব-রক্ষকের চাকরি না করে ব্যবসায়ী হয়ে লাখ টাকা উপার্জন করতে পারতেন।

ক্লাবের দোতলার লাউঞ্জে শেঠ বাঙ্গা রাসের জমজমাট অনুষ্ঠান চলছে। ভাইয়াজী সাদা মলমলের মিহিন ধুতি পরিধান করে সেপ-এর বোতাম লাগানো আচকান গায়ে মৃদু হেসে এলোমেলো পায়ে হেঁটে ক্লাবে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

এখানে আসুন, ভাইয়াজী।

না, এখানে বসুন।

আমার কাছে বসুন।

না, আমার কাছে আসুন।

রাণী হীরাবাঈ ঝাউংকর নীলমের আংটি দুলিয়ে বললেন, দেখুন কখন থেকে আপনার পথ চেয়ে আছি!

ভাইয়াজীর হালকা-পাতলা দেহ গর্বে তীরের ফলার মতো সোজা হয়ে গেল। ভাইয়াজী চারদিকে একবার তাকিয়ে রাণী হীরাবাঈ, মিস নিলুফার ও মিসেস জগন-এর মাঝখানে একটা খালি চেয়ার নিয়ে বসে পড়লেন। সবাই হাসলো। প্রিন্স ফিরোজ বললেন, চমৎকার, ভাইয়াজীর মধ্যে কি যে গুণ আছে, মেয়েরা তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আমাদের তো কেউ জিজ্ঞেসও করে না। সম্ভবতঃ তিনি কোন মন্ত্র শিখে এসেছেন। এ কথায় সবাই আবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, কিন্তু ভাইয়াজীর হাসির আওয়াজ সবাইকে ছাড়িয়ে গেল।

শেঠ বাঙ্গা নিজে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোন হুইস্কি খাবেন আজ?

রাজকুমারী কমলাবাঈ বলল, দেখুন আমি স্যাম্পেন খাচ্ছি, আপনিও স্যাম্পেন খান।

ভাইয়াজী কমলার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমিও স্যাম্পেন খাব।

সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়াজীর জন্য স্যাম্পেন এসে হাজির হলো।

মিস নিলুফার ভাইয়াজীর প্রতি একটুখানি ঝুঁকে তাঁর আচকানের বোতাম ছুঁয়ে বলল, আমার মনে হচ্ছে এগুলো মুক্তোর তৈরী।

ভাইয়াজী বললেন, না—না, সেপ-এর।

রাণী হীরাবাঈ বললেন, সেপ-এর? অসম্ভব, এতো মুক্তোর বোতাম।

শেঠ আপর চাঁদ জহুরী নিজের আসন ছেড়ে ভাইয়াজীর কাছে এসে গভীরভাবে বোতাম দেখে তাঁকে ছুঁয়ে বললেন, ওস্তাদ, আমাদের বোকা বানাচ্ছেন, এতো নির্ভেজাল মুক্তোর তৈরী বোতাম, অথচ আপনি বলছেন সেপ-এর। বিশ বছর ধরে জহুরী হিসেবে কাজ করে কি কিছুই চিনি না?

ভাইয়াজী রহস্যময় হাসি হাসলেন, মুখে কিছুই বললেন না। ভাবলেন, ওরা যদি ভুল করে তবে ভুল ভেঙ্গে নিজের পজিশন খাটো করব কেন? তারপর তিনি মদের পেয়ালায় দীর্ঘ চুমুক দিলেন এবং রাণী হীরাবাঈ-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, আজকের তাজা হাসির গল্প শুনেছেন?

না তো!

বড় মজার গল্প।

রাণী হীরাবাঈ বললেন, আজ গল্প শুনব না, আপনি বরং নতুন কবিতা শোনান।

ভাইয়াজী সঙ্গে সঙ্গে নিজের অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে বললেন, শুনুন রাণীজী, আজই এ কবিতা লিখেছি:

কি যে হলো বুঝিনে তোর ওরে নাদান মন/জানি না তো আছে কিনা এ রোগের অষুধ।

কুমার বলদেব সিং উচ্চস্বরে বাহবা দিয়ে বললেন, চমৎকার! চমৎকার! 'নাদান মন'-এর তুলনা হয় না। বোম্বেতে বিশটি ড্রাগ হাউসের মালিক এবং বিলেতী অষুধের সবচেয়ে বড় সওদাগর সেই হীরানন্দের দিকে তাকিয়ে কুমার বলদেব সিং বললেন, আপনি কিছু বুঝেছেন?

শেঠ হীরানন্দ কানে কম শুনতেন, এ জন্য কুমার বলদেব সিং-এর

চীৎকারে চমকে উঠে বললেন, ভাইয়াজী, কবিতাটি আবার বলুন তো, কুমার বলদেব সিং আমার কাছে এর অর্থ জিজ্ঞেস করছেন।

ভাইয়াজী একইভাবে আবৃত্তি করলেন:

কি যে হলো বুঝি না তোর ওরে নাদান মন/জানি না তো আছে কিনা এ রোগের অষুধ।

শেঠ হীরানন্দ কুমার বলদেব সিংকে বুঝিয়ে বললেন, খুব সহজ অর্থ, ডাক্তার বলছে, হে রোগী তোর কি হয়েছে? রোগী বলছে এ রোগের অষুধ তো আমার জানা নেই। এতে ডাক্তার বলছে, মন নাদান।

কিন্তু মন নাদান কি জিনিস শেঠজী? কুমার বলদেব সিং আবার জিজ্ঞেস করেন।

শেঠ হীরানন্দ বললেন, আমার মনে হয় আগেকার দিনের কোন অষুধের নাম। তাই না ভাইয়াজী?

আপনি ঠিকই বলছেন। ভাইয়াজী মাথা নেড়ে বললেন এবং পরবর্তী পংক্তি আবৃত্তি করলেন:

আমার মুখে জিহ্বা আছে বুঝলে হে? কি চাই তা একটু তুমি জিজ্ঞেস কর তো?

শেঠ হীরানন্দের ভাই শেঠ সুখানন্দ এ পংক্তি শুনে সবচেয়ে বেশী মাথা দোলাচ্ছিলেন। কুমার বলদেব সিং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বলুন তো এ পংক্তিতে কি বলা হয়েছে? আমি তো কিছু বুঝতে পারলাম না।

শেঠ সুখানন্দ কুমার বলদেব সিংকে বুঝিয়ে বললেন, খুবই সরল সোজা অর্থ কুমারজী। কবির মুখে জিহ্বা আছে, কাজেই কি চাইতে পারে?

কি চাইতে পারে? কুমার জিজ্ঞেস করলেন।

সুখানন্দ বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললেন, রুটি, রুটি।

কুমার বলদেব বিস্ময়ে মাথায় হাত দিলেন।

ভাইয়াজী স্বরচিত উর্দু কবি গালিবের কবিতার তৃতীয় পংক্তি শোনাতে যাবেন এমন সময়ে রাণী হীরাবাঈ ঝাউংকর তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনার সাথে একটা কাজ আছে ভাইয়াজী।

বলুন রাণীজী। ভাইয়াজী বিনয়ে গলে গেলেন।

রাণী বললেন, আমার হিসেব-নিকেশে গোলমাল দেখা দিয়েছে। আমার হিসেব-রক্ষক ব্যাটা একটা গবেট। কি যে হিসেব করে ভগবানই জানেন, প্রতিবছর আয়কর না কমে শুধু বেড়েই চলেছে। আমি সব তৈরী করে রেখেছি, আপনি শুধু আমার হিসেবটা একটু মিলিয়ে দেবেন। আপনাকে না হলেই নয়। এ কাজের জন্য আপনাকে তিন হাজার টাকা দেব। আগামীকাল বিকেল থেকেই কাজ শুরু করুন।

ভাইয়াজী হেসে বললেন, আমি তো আপনার দাস, রাণীজী। আপনি কিছু মাত্র চিন্তা করবেন না, আমি সব ঠিক করে দেব।

রাণী বললেন, কালই বিকেলে আপনি আমার বাসায় আসুন, কাজ বুঝিয়ে আপনাকে পাঁচশ' টাকা অগ্রিম দিয়ে দেব।

তার কি দরকার রাণীজী?

সেটা তো সব সময়ে সকলেরই প্রয়োজন ভাইয়াজী।

এ সময়ে রাণীজী ও ভাইয়াজীকে এককোণে আলাপ করতে দেখে মিস নিলুফার চীৎকার করে বললো, আরে ভাইয়াজী ওখানে এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে কি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন, সব অধিকার রাণীকে লিখে দেবেন না কিন্তু, কিছু আমাদের জন্যও রেখে দেবেন। এখন এদিকে আসুন।

ভাইয়াজী হাসিমুখে মিস নিলুফারের দিকে এগিয়ে গেলে সেই উবটনওয়ালা চীৎকার করে বললেন, কি ব্যাপার প্রিন্স ফিরোজ, ভাইয়াজীর মধ্যে কি এমন রয়েছে যে কারণে সব সময়ে সুন্দরী মেয়েরা তাঁকে ঘিরে থাকে?

প্রিন্স ফিরোজ লম্বা সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল, আরে আমার তো কিছুই বুঝে আসছে না। এতোদিন শুনেছিলাম যে, সুন্দরী মেয়েরা হলো গিয়ে মোরব্বার ডিব্বা, তাদের চারদিকে পুরুষরা পিপীলিকার মত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এখানে তো মেয়ে নয় একটা পুরুষই মোরব্বার ডিব্বা হয়ে আছে।

হি ইজ এ ডার্লিং!—মিস নিলুফার প্রীতিভরা চোখে ভাইয়াজীর দিকে এমনভাবে তাকালো যে সবাই হেসে লুটোপুটি খেলো।

অনুষ্ঠান যখন পূর্ণোদ্যমে চলছে তখন শেঠ উবটনওয়ালা ঘোষণা করলেন যে, কাল অপরাহ্নে দোহার ঝিলে এক বিশেষ পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে। দিনের বেলায় সেখানে মাছ শিকার করা হবে এবং রাতে কাওয়ালী গীত হবে।

লাখপতি যুবক প্রিন্স ফিরোজ মিস নিলুফারের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, মাছ রাতে ধরা হবে না কেন?

নিলুফার চোখের সামনে স্যাম্পেনের পেয়ালা তুলে ধরে বলল, পিছলে যায় তাই। এই বলে সে স্যাম্পেন পানে মনোযোগ দিল।

ফিরোজ ভাবতে লাগলো যে, স্যাম্পেনে ভেজা এই হালকা গোলাপী ঠোঁটের গঠন কি সুন্দর, নিলুফার কতো হাল্কা করে লিপষ্টিকের প্রলেপ দেয়, আজকালকার মেয়েরা নিজেরাই শিল্পী, নিজেরাই শিল্প, নিজেরাই মাছ, নিজেরাই জেলে।

শেঠ উবটনওয়ালা চীৎকার করে বললেন, আরে ভাইয়াজীর গ্লাস খালি পড়ে আছে, স্যাম্পেন লও। তারপর নিজের হাতে ভাইয়াজীর গ্লাসে স্যাম্পেন ঢেলে দিয়ে বললেন, কাল বিকেলে অবশ্যই আসবেন।

ভাইয়াজী স্যাম্পেনের সপ্তম গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন, আসব এবং সাথে একটা কাওয়ালী নিয়ে আসব।

আপনি এখানে ক্লাবে আসবেন, আমি আপনাকে স্টেশন ওয়াগনে তুলে নিয়ে যাব।

ঠিক আছে। ভাইয়াজী শান্তভাবে মাথা নেড়ে বললেন।

পরদিন, নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা আগেই ভাইয়াজী ক্লাবের লাউঞ্জে গিয়ে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর প্রিন্স ফিরোজকে যেতে দেখে বললেন, প্রিন্স ফিরোজ, আজ তোমাকে একটি নতুন জোক শোনাব। এক সেলসম্যান ছিল, সে স্টোরে কালো পান বিক্রি করতো।

প্রিন্স ফিরোজ বলল, হুজুর, নীল বিক্রি করতো না, কালো বিক্রি করতো কেন?

ভাইয়াজী চমকে উঠলো।

এ যাবৎ প্রিন্স ফিরোজ তাঁর সাথে কখনো এ রকম কথা বলেনি।

মনের অবস্থা ভাল ছিল এজন্য এ উপেক্ষায় চুনি ভাই কিছু মনে করলেন না, হেসে বললেন, আরে ইয়ার জোক তো আগে শোনো!

ফিরোজ তপ্তকণ্ঠে বলল, ইয়ার কোন ইয়ার, কার ইয়ার? মাফ করবেন চুনি ভাই, এ ধরনের রসিকতা আমি পছন্দ করি না। এই বলে প্রিন্স ফিরোজ হন হন করে হেঁটে চলে গেলো।

বিস্ময়ে চুনি ভাইয়ের মুখে কথা এলো না। তার বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল মোটা, এ জন্য কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা ভুলে গেলেন।

কুমার বলদেব সিংকে যেতে দেখে বললেন, কুমারজী, আমি আজকের অনুষ্ঠানের জন্য নতুন একটা কাওয়ালী এনেছি। আপনি প্রথম কিছু অংশ শুনুন।

কুমার বলদেব সিং বললেন, মাফ করবেন ভাইয়াজী, আমার এখন সময় নেই। আর আপনার কাওয়ালী শুনেই বা কি করব তাতে মাত্রাজ্ঞান, সুর, ছন্দ কিছুই থাকে না। যেমন আপনার কাওয়ালী, তেমনি আপনার জোক। আমি আপনার উপর খুবই বিরক্ত। এই বলে কুমারজী বিরস মুখে হেঁটে গেলেন।

ভাইয়াজীর মাথা ভন্ ভন্ করে ঘুরতে লাগল।

ক্লাবে আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে এভাবে অপমান করেনি। প্রিন্স ফিরোজ, কুমারজী কেউ তাঁকে আজ আমল দিচ্ছে না। তাদের যে আজ কি হয়েছে!

কিছুক্ষণ পর ভাইয়াজী রাণী ঝাউংকরকে তাঁর দিকে আসতে দেখে আনন্দে আবেগে এতোটা উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন যে, রাণীকে অভিবাদন জানাতেও ভুলে গেলেন।

কিন্তু রাণী হীরাবাই তাঁর কাছে এসে বেশীক্ষণ দেরী করলেন না। তাড়াতাড়ি যেতে যেতে বললেন, আপনি কাল বিকেলে যাবেন না। একটা জরুরী কাজে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে।

আমি তাহলে দু'দিন পরে আসব।

তার প্রয়োজন হবে না, আমি ফিরে এসে আপনাকে টেলিফোন করব। আপনি খামাখা কষ্ট করবেন না। বাই বাই! এই বলে রাণী

হীরাবাই দ্রুত পায়ে লাউঞ্জের ওপাশে হেঁটে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর শেঠ উবটনওয়ালা লাউঞ্জে প্রবেশ করে চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। ক্লাবের বিভিন্ন স্থানে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে খোশগল্পে মেতে আছে।

শেঠ উবটনওয়ালা পিকনিকে নিমন্ত্রিত বন্ধুদের দেখে নিলেন। তারপর বললেন, ভাইসব, তৈরী হয়ে যান, আমি আপনাদের নিতে এসেছি। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন।

কুমারজী
প্রিন্স সাহেব
শেঠ বাঙ্গা
সুখানন্দ
হীরানন্দজী
নসরওয়ানজী
কুমারী কমলা
মিস নিলুফার
মিস রাজিয়া ··

শেঠ উবটনওয়ালা একে একে সব নাম বলে ডাকতে লাগলেন এবং একত্রিত করে গাড়ীতে পাঠাতে শুরু করলেন। দু'তিনবার তিনি চুনি ভাইয়ের পাশ দিয়া গেলেন কিন্তু ভাইয়াজীর প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল না। অথচ ভাইয়াজী তার প্রতি দু'তিনবার হাত বাড়িয়েছেন। বিপরীত থেকে কোন জবাব এলো না।

ভাইয়াজী এখন স্বগতভাবে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বেচারা আজ কি যে ব্যস্ত। নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে ভাইয়াজী শেঠ উবটনওয়ালার কাছে গিয়ে নিজেই ঘুরাঘুরি করতে লাগলেন। কিন্তু শেঠ তার প্রতি ফিরেও তাকালেন না।

ক্লাবের দু'তিনজন ছাড়া গাড়ীতে সবাই প্রবেশ করার পর ভাইয়াজী শেঠ উবটনওয়ালাকে শেষবারের মতো নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে বললেন, সবাই তো গাড়ীতে উঠে বসেছে। তবে কি আমি ষ্টেশন

ওয়াগনে গিয়ে উঠব?

শেঠ রুক্ষভাবে বললেন, ওহ, সরি, ষ্টেশন ওয়াগনে এখন তো আর কোনো জায়গা নেই। এই বলে শেঠ অন্য দিকে ফিরে বললেন, এই পাকশী, দেখ তো সব লেডিজ গাড়ীতে বসেছে কিনা। একটু চেক করে নাও! আমি অন্যদিকে দেখছি। তারপর শেঠ তার দু'তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে লাউঞ্জের দিকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘটনাক্রমে লাউঞ্জে তখন একজন লোকও ছিল না, একদম খালি। ষ্টুয়ার্ড তার সহসাথীকে নিয়ে এককোণের জানালায় দাঁড়িয়ে আলাপ করছিল। ভাইয়াজী একটা চেয়ারের এককোণে বসে মাথার ঘাম মুছতে লাগলেন।

সহকারী ষ্টুয়ার্ডকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, আজ ভাইয়াজীকে কেউ জিজ্ঞেস করছে না, কেউ কথাও বলছে না। বেচারা একাকী বসে আছে। ষ্টুয়ার্ড ভাইয়াজীর দিকে ব্যঙ্গাত্মক চোখে তাকিয়ে বলল, ভাইয়াজীর ছোটভাই আজ বদলী হয়েছে।

কোন ভাই, আয়কর কমিশনার?

হ্যাঁ, আজ তাকে বোম্বে থেকে দিল্লীতে বদলী করা হয়েছে।

ও এই কথা! সহকারী হাততালি দিয়ে উঠল।

ভাইয়াজী মাথার ঘাম মুছে মস্তিষ্কের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একটা বেয়ারাকে ডেকে বললেন, আমার জন্য স্কচের একটা বড় বোতল নিয়ে এসো।

কার হিসেবে আনবো সার? আপনি তো আর ক্লাবের মেম্বার নন।

ভাইয়াজী চমকে উঠলেন এবং সাথে সাথে ক্ষেপে গেলেন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কারো নামে নিয়ে এসো। প্রতিদিন তো আনো। আজকে জিজ্ঞেস করছ কার হিসেবে আনবো? প্রিন্স ফিরোজ, কুমার, উবটন-ওয়ালা—কারো নামে নিয়ে এসো।

আজ অর্ডার নেই।

কি বললে? ভাইয়াজী গর্জন করে বললেন এবং চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন।

বেয়ারা মাথা নীচু করে ভদ্রভাবে বলল, আজ থেকে অর্ডার নেই সার।

চুনি ভাই কিছুক্ষণ বিস্মিতভাবে বেয়ারার প্রতি তাকিয়ে থেকে সব যেন বুঝতে পারলেন। তাঁর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। দ্রুতপায়ে তিনি ক্লাব থেকে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন থেকে তাঁকে কেউ আর বুরবন ক্লাবে যেতে দেখেনি।

—সমাপ্ত—

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900